# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সপ্তপঞ্চাশৎ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৫৭শ ভাগের

# প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা
১৩৫৭

# বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ ও রামেন্দ্রসুন্দর স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন[১]। এই ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সর্ব্বথা উপেক্ষা করিবে না সত্য, তবে অন্ধভাবে হুবহু অনুকরণও করিবে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে' (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।৫৭৮)। বস্তুতঃ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে'[২]। মোটামুটি ভাবে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।...কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য।'[৩] তবে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগেও বাংলা ভাষায় সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃতের নিয়ম উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন অবশ্যই নিছক যথেচ্ছচারিতার পরিচায়ক নহে। অজ্ঞতা ইহার মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই—তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহার অন্তরালেও যে একটা ভাষাতত্ত্ব-সম্মত যুক্তি, শৃঙ্খলা ও নবীন নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল দোষদর্শন বৈয়াকরণের কার্য্য নহে—বহুল প্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়মবিরুদ্ধ হউক না কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিয়া বা নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবশ্যকর্তব্য কর্ম। ইহা ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র নহে, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। তাই প্রাচীনেরা বলিতেন 'স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয়া'—যাহা বর্তমান, যাহা প্রচলিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্যই দেখা যায়—অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নূতন নূতন প্রয়োগ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন বৈয়াকরণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, নানারূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সহসা কোন প্রয়োগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এ বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণের লক্ষ্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'[বাংলা ভাষা] সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ' (রবীন্দ্র-রচনাবলী—১২।৫৬৯)।

---

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী—দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৬৪, ৬৩১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১, ২০১।

২। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—বাঙ্গালা ভাষা, পৃ. ১০৮।

৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শব্দকথা, পৃঃ ১৫৭।

দুঃখের বিষয়, প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে এ দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃত নিয়মানুসারে খাঁটি বাংলা প্রয়োগের বিশ্লেষণেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণের এইরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি বৈয়াকরণ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে সকল শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সমর্থন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণকে উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করাই আমার কার্য। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ব্যাকরণবিরোধী শব্দ চালাইতে পারিবেন, এমন কথাও বলা চলে না। বহুপ্রচলিত শব্দগুলিই আমার আলোচনার বিষয়। বৈয়াকরণ বা আভিধানিক কেহই এগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উপেক্ষিত হইলেই যে সেগুলি আর ব্যবহৃত হইবে না, এমনও বলা চলে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ( ১৩৫০ শ্রাবণ ) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন উপাদান সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য।

ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ অনুসারে আমার বক্তব্যগুলি সজ্জিত করিয়াছি। প্রত্যেক প্রকরণে এতদতিরিক্ত খুঁটিনাটি আরও অনেক বিচার্য বিষয় আছে। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। অথচ বাংলা ব্যাকরণকে তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন। বিভিন্ন লেখকের লেখা বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, তাহাদেরও সুমীমাংসার চেষ্টা করার সময় আসিয়াছে। এ জন্য বাংলা ভাষারসিক ব্যক্তিমাত্রের আগ্রহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

**সন্ধি**।—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় উপেক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদসমষ্টির মধ্যে সকল স্থানে পরস্পর সন্ধি না করার একটা প্রথা বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলায় এরূপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সত্য সত্যই ব্যাকরণের শাসন সত্ত্বেও 'প্রতিষ্ঠা-উৎসব', 'প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে' না বলিয়া 'প্রতিষ্ঠোৎসব' 'প্রতিষ্ঠোপলক্ষ্যে' বলিতে কানে ঠেকিবে। অন্য দিকে সন্ধি না করিলে শব্দের আয়তন সংক্ষেপ না হওয়ায় উহার ধ্বনিগাম্ভীর্য সুরক্ষিত হয়।

বিসর্গ স্থানে 'র' প্রভৃতির ব্যবস্থা বাঙালীর দিক্ হইতে অনেক ক্ষেত্রে শ্রুতিকটুতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। খাঁটি বাংলা শব্দে বিসর্গ নাই—শব্দের অন্তে বিসর্গের উচ্চারণ দুঃসাধ্য। তাই বিসর্গ এখন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইতেছে। চক্ষুদান, চক্ষু চিকিৎসা, চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ, জ্যোতিভূষণ, তেজী, মনান্তর প্রভৃতি বহু শব্দে বাঙালী বিসর্গকে বেমালুম বাদ দিয়া দিয়াছে। 'মনঃকষ্ট' বিসর্গের সহিত উচ্চারণ করা কঠিন বলিয়া বাঙালী উহাকে 'মনোকষ্ট' করিয়া লইয়াছে। মনোমোহন, জগন্মোহন, জগদ্‌বন্ধু উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহার কাছে মন্‌মোহন, জগমোহন, জগবন্ধু রূপ ধারণ করিয়াছে। সাহিত্যের

ভাষায় সর্ব্বত্র এরূপ লেখার ব্যবহার না থাকিলেও শব্দগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে সন্দেহ নাই।

**সমাস**।—প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে বাংলা পদের সমাস নিরূপণে সাধারণতঃ সংস্কৃত নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে সত্য। তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবশ্য করণীয়। এই প্রসঙ্গে তৎপুরুষ সমাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত উদাহরণ সাধারণতঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে সেগুলি ঠিক সেই সমস্ত বিভাগের মধ্যে পড়ে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। খাঁটি বাংলা শব্দের প্রসঙ্গে তৎপুরুষের শ্রেণী-বিভাগের সমস্যা কঠিন। বাংলায় প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় দ্বিতীয়ান্তাদি পদের সহিত বিহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ প্রভৃতি নামকরণে অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এরূপ নামকরণ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কোনও নামই দেন নাই—পূর্বপদের কারকের নাম উল্লেখ করিয়া কর্মকারকে, করণকারকে, সম্প্রদানকারকে প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়াছেন। (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ২১৫)। কিন্তু সমস্যার সমাধান ইহাতেও হয় নাই—এ পদ্ধতি অন্য কেহ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াও জানি না। কারক বা বিভক্তি যে অনুসারেই শ্রেণী-বিভাগ করা হউক না কেন, প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যে সব উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি সংস্কৃত নিয়মবিরোধী—কোন কোন স্থলে বাংলা বিশ্লেষণেও তাহাদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্তগুলির ব্যাসবাক্য বাংলা ভাষায় একরূপ অচল—কাপড়কে ধোয়া, ভাতকে খাওয়া, বাসনকে মাজা আমরা কখনও ভাষায় ব্যবহার করি না। পক্ষান্তরে সাধু ভাষায় পরিবর্তিত করিলে এই শব্দগুলিকে আর দ্বিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত বলা যায় না—'বস্ত্রধাবন' নিঃসন্দেহে সকলেই ষষ্ঠীতৎপুরুষনিষ্পন্ন বলিবেন। অবশ্য কাপড়ের ধোয়া, বাসনের মাজা এরূপ কথাও আমরা ভাষায় ব্যবহার করি না। তবে ঐরূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বলিলে যুক্তিসঙ্গত হয় এবং সাধু ভাষার সহিত সামঞ্জস্য বজায় থাকে। চতুর্থী তৎপুরুষরূপে নির্দিষ্ট বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নিয়মানুসারে ষষ্ঠীতৎপুরুষনিষ্পন্ন। সুতরাং বাংলায়ও সেইরূপ বলাই সঙ্গত। গৃহহারা, ঘরছাড়া, গোলাভরা প্রভৃতি শব্দগুলিকে তৎপুরুষ-নিষ্পন্ন না বলিয়া বহুব্রীহিনিষ্পন্ন বলিলেই শোভন হয় বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ, 'গোলায় ভরা'কে সপ্তমীতৎপুরুষ বলিলে প্রকৃত তাৎপর্যই পরিস্ফুট হয় না। 'গোলায় ভরা' যে কোন পরিমাণের ধানকেই আমরা 'গোলাভরা ধান' বলি না—ভরা বা পরিপূর্ণ গোলা যাহার দ্বারা, তাহাকেই 'গোলাভরা' বলিয়া থাকি। সুতরাং এস্থলে বহুব্রীহি সুস্পষ্ট। বিশেষণের পরনিপাতও সংস্কৃত নিয়মসিদ্ধ এবং বাংলা প্রয়োগের সর্বথা অনুকূল। ঘোমটা-পরা মেয়ে, আলপনা আঁকা দেয়াল, ফুলতোলা রুমাল, ঘরছাড়া ছেলে প্রভৃতি

চলতি ভাষার শব্দ ছাড়া পট্টবস্ত্র-পরিহিত, আত্মবিস্মৃত, মতিচ্ছন্ন, নদীজপমালাধৃত প্রভৃতি সাধু ভাষার শব্দেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যানিধি মহাশয়ও তাই স্পষ্টতঃ নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন—বাঙ্গালাতে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ আছে, কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণপদ বিশেষ্যের পরে যায় ( বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ২১৭ )। এতৎসত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থে এ জাতীয় শব্দকে যে বিভিন্ন সমাসের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ তাহাতে অর্থের সুসঙ্গতি করাও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

সমাসনিরূপণের সময় অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার[৪]—অর্থসঙ্গতি থাকিলে একই পদকে বিভিন্ন সমাসসিদ্ধ বলিতেও কোন আপত্তি নাই। যত দিন সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইবে, তত দিন সংস্কৃতের নিয়মও একেবারে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রভাকর, বিভাকর প্রভৃতি শব্দে ষষ্ঠীতৎপুরুষ না বলিয়া উপপদ তৎপুরুষ বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? উপপদ তৎপুরুষ করিলে সংস্কৃতে এগুলির রূপ দাঁড়াইবে কর্মকার, চর্মকারের মত প্রভাকার, বিভাকার। অবশ্য ধনহীন প্রভৃতি শব্দের বেলায় হয়ত আমরা সংস্কৃত নিয়ম যথাযথ অনুসরণ না করিতেও পারি। 'ধনের দ্বারা হীন' এরূপ ব্যাসবাক্য বাংলায় অতিশয় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে 'ধনে হীন' বলিয়া সপ্তমীতৎপুরুষ করিলে শোভন হইতে পারে। বক্তার অভিপ্রেত অর্থানুসারে সংস্কৃতে যখন কারক ও বিভক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে ( বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি ), তখন ইহা একেবারে সংস্কৃতবিরোধীও হইবে না। বাংলা সমাসের বহু স্থলে এইরূপ খুঁটিনাটি আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

এইবার আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত নিয়মবিরোধী বহুলপ্রচলিত কতকগুলি শব্দের আলোচনা করিব। নির্দোষী, নিরপরাধী প্রভৃতি শব্দ বাংলা ব্যাকরণে সাধারণতঃ অশুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অথচ এজাতীয় অজস্র প্রয়োগ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়—সাহিত্যিকদের লেখায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইতে পারে। নিষ্করুণ, নির্ভাবনা, নিরাশা, নিরভিমানী, নির্লিপ্ত, নির্বিরোধী, নিরুদ্বিগ্ন, নিরুদ্দিষ্ট, নিঃসঙ্গী, নিরলস, নির্বিবাদী, নির্বারিত, নিরাসক্ত, নিশ্চঞ্চল ( রবীন্দ্রনাথ )। নিরবচ্ছিন্ন, নিরবদ্য, নিরশন প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতেও একেবারে অপরিচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে এতগুলি শব্দকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া লাভ নাই। বরঞ্চ 'নিঃ' শব্দ এখানে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া এগুলিকে নঞ্‌তৎপুরুষ বা প্রাদিতৎপুরুষের রূপভেদ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

---

৪। যথাসম্ভব সমস্যমান পদের সাহায্যে এই অর্থ নিরূপণের চেষ্টাই ব্যাসবাক্যের কার্য। এজন্য ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদাতিরিক্ত নূতন পদসন্নিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বস্তুতঃ 'খাইখরচে'র ব্যাসবাক্য 'খাওয়ার খরচ' না করিয়া 'খাইর খরচ' বলা উচিত। ( খাওয়া অর্থে খাই শব্দের প্রচলন উত্তরবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় )। অন্যত্রও এইরূপ।

সচল, সচকিত, সশঙ্কিত, সক্ষম, সঠিক, সকাতর, সকরুণ, সচঞ্চল ( আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর,—নবীনচন্দ্র ) প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাংলায় বহুল ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদেরও একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এসকল স্থানে সংস্কৃত নিয়মানুসারে বহুব্রীহি সমাস হয় নাই—এখানে সংস্কৃতের মত 'স' 'সহ'র বিকৃতি নয়—ইহা বাংলায় আতিশয্যবাচক স্বতন্ত্র শব্দ বা অর্থহীন ধ্বনি মাত্র। চলতি ভাষার 'সাবকাশ' শব্দেও এই 'স'এরই সন্ধান মিলে। বলরাম কবিশেখর তাঁহার কালিকামঙ্গলে এইরূপেই 'সাদর করিয়া' ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা শব্দে গঠিত বহুব্রীহি সমাসে অনেক স্থানে পরপদে আকারযোগের যে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দেও সেই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে দেখা যায়। অভাগা, হতভাগা, দুর্ভাগা, নির্জলা, নিষ্ফলা প্রভৃতি শব্দে ইহার দৃষ্টান্ত মিলে। অথচ সংস্কৃতমতে যেখানে আকার অভিপ্রেত, সেখানে 'ঈ'কার ব্যবহারের ঝোঁক দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সহকর্মী, স্নেহধর্মী, বিধর্মী, জীবাণুনাশধর্মী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য ঈকার সংস্কৃতমতে সমর্থন করা কঠিন। অবশ্য সংস্কৃতেও সহধর্মিণী শব্দের প্রয়োগ আছে। সমাসান্তবর্তী বিশেষণ মহৎ শব্দকে মহারূপে পরিবর্তনের বিধান সংস্কৃতে থাকিলেও বাংলায় এখন অনেকেই মহদুপকার, মহদাশয় বা মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অবশ্য এখনও কেহ মহৎপুরুষ শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃত-মতে অকারান্ত মহারাজ শব্দই বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও রাজার সাদৃশ্যে মহারাজা শব্দ ব্যবহার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বাংলায় পন্থা একটি স্বতন্ত্র শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মপন্থা প্রভৃতি প্রয়োগ চলিতেছে। ভাষার ঐ বৈচিত্র্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মতই দুরবগাহ।

অনুবাদমূলক বিজাতিগন্ধি কতকগুলি শব্দের সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এগুলি ইংরাজির আক্ষরিক অনুবাদ—শব্দগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় না। জন্মবার্ষিকী, শতবার্ষিকী প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।[৫] মনোমুগ্ধকর আইন অমান্যকারী, সাধ্যাতীত, সহ্যশক্তি প্রভৃতি স্থানে বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ধরিতে হইবে। বস্তুতঃ চলতি গ্রাম্য ভাষায় কোথাও কোথাও মান্য, অমান্য ও সাধ্য স্বতন্ত্রভাবেও বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**কৃৎপ্রত্যয়**।—কৃৎপ্রত্যয়ের মধ্যে শতৃ, শানচ্ ও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহারের বৈচিত্র্য উল্লেখ-যোগ্য। প্রাচীন ও চলতি বাংলায় শতৃ প্রত্যয়ের বাংলা রূপের নিদর্শন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত,

---

৫। নূতন শব্দ গঠনের সময় বিশেষ সতর্ক না হইলেই এইরূপ অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসতর্কতার ফলে বর্তমানে বাংলা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে—ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠককে বহু স্থলে ইংরাজির মারফত বাংলার অর্থ করিতে হয়। ইহা বিশেষ দৈন্যের কথা সন্দেহ নাই।

অনন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত, পড়ন্তি বেলা, উঠন্তি বয়স, বহন্তা নদী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে বা সাধু ভাষায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। তাহার স্থলে শানচ্ প্রত্যয়ের বা তাহার 'মান'রূপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। বাংলায় কিন্তু ইহা নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে। এমন কি, শব্দের পরও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়া 'অন্তমান' শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইরূপ অবাধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে চলমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহ্যমান, রুদ্ধমান, ভাসমান, মজ্জমান, প্রশংসমান প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ শব্দটী উল্লেখযোগ্য। আকৃতি দর্শনে কেহ কেহ ইহাকে চলমানাদি শব্দের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, তবে ইহার আসল অর্থ—'যাহা বলা হইতেছে' নয়, কিন্তু 'যাহা বলা হইবে।'

ক্ত প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলায় যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে বাংলা শব্দে ধ্বনিগৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। তাই মূল ধাতুকে অকারণে ণিজন্ত করা হয় এবং ধাতুর উত্তর অস্থানে ইকার যুক্ত হয়। ফলে বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, প্রস্তুত স্থলে প্রস্তাবিত, অনূদিত স্থলে অনুবাদিত, খাত স্থলে খনিত, স্পৃষ্ট স্থলে স্পর্শিত, কৃষ্ট স্থলে কর্ষিত, ব্যূঢ় স্থলে বিবাহিত, আবৃত স্থলে আবরিত, আহৃত স্থলে আহরিত, ক্ষীণ স্থলে ক্ষয়িত, বিবৃত স্থলে বিবরিত, সিক্ত স্থলে সিঞ্চিত, বিতীর্ণ স্থলে বিতরিত প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সকর্মক ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট বলিতে আমরা যাহাকে দংশন করা হইয়াছে, তাহাকে বুঝি, দংশনকর্তাকে বুঝি না। ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই ব্যতিক্রমকে সমর্থন করিবার জন্য বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। চলতি বাংলায় কিন্তু এইরূপ একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি ভুক্ত না অভুক্ত, তিনি স্বীকৃত হইলেন। সংস্কৃতরসিকের নিকট বাংলার এই প্রয়োগগুলি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নাই।

ধ্বনিসাম্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিকরণ স্থলে বিকিরণ, উদ্গরণ স্থলে উদ্গিরণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সিঞ্চন, সৃজন, জাগ্রত—শব্দগুলি সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও আজ বংলায় তাহাদের অধিকার পাকা করিয়া লইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই নামধাতুর কয়েকটি বিচিত্র প্রয়োগের উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য কৃৎপ্রত্যয়ের সহিতই বাংলায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ম্লানায়মান, ঘনায়মান, শ্যামায়মান, দীর্ঘায়িত, তরঙ্গায়িত প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট অর্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও রূপায়িত, লীলায়িত এবং রবীন্দ্রনাথের বহুশাখায়িত ও অলঙ্করণরেখায়িত প্রভৃতি শব্দ নূতন অর্থে রচিত হইয়াছে মনে হয়। এখানেও শব্দকে পল্লবিত করিয়া তাহার ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সুখের বিষয়,

এইরূপভাবে নূতন রচিত উদ্বেলিত, ব্যাকুলিত শব্দ আপাতদৃষ্টিতে অশুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহাদিগকে সংস্কৃত নিয়ম অনুসারেও অনায়াসেই সমর্থন করা যায়। উদ্বেল করিতেছে, ব্যাকুল করিতেছে, এই অর্থে উদ্বেল ও ব্যাকুলকে নামধাতু করিয়া নিয়া তাহার পরে 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে সৃষ্ট শব্দ দুইটির অর্থ দাঁড়ায় 'উদ্বেলীকৃত', 'ব্যাকুলীকৃত'। প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এই অর্থের বিশেষ কিছু বিরোধ নাই।

**স্ত্রীপ্রত্যয়।**—খাঁটী বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয় সাধারণতঃ ঈ, ই, ইনী বা ইনি। এই সব প্রত্যয় বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দেও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অভাগী, অভাগিনী, হতভাগী হতভাগিনী, অধীনী, ননদিনী, ননদী, দিগম্বরী, ভয়ংকরী, কিংকরী, চন্দ্রবদনী, সুকেশিনী, অর্ধাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, উন্মাদিনী—ইহাদের কোনটাই সংস্কৃত নিয়মানুসারে শুদ্ধ না হইলেও বাংলার রীতি অনুসারে দোষহীন। চণ্ডীদাসের রজকিনী, কৃত্তিবাসের পাপিষ্ঠী বাংলার এই নিয়মেরই সাক্ষ্য বহন করে। সম্ভবতঃ এই প্রথার অনুসরণ করিয়াই মধুসূদন গায়কী, নায়কী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, নূতন শব্দ সৃষ্টি করিলেই ভাষা তাহা নির্বিবাদে মানিয়া লয় না। তাই আলোচ্য বিষয়ে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস বা মধুসূদনের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় নাই। তবে ব্যাকরণরচয়িতার পক্ষে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন—'বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' 'ই' পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃতব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালী হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে।…সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এই জন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে'[৬] (রচনাবলী ১২।৫৭০)। এই প্রসঙ্গে অরণ্যানী শব্দের আদর্শে রচিত বনানী শব্দটী স্মরণীয়।

পুরাণ বাংলায় কোন কোন স্থলে আকারান্ত বালা, প্রিয়া প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত না হইয়া পুংলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আকারান্ত বলিয়াই শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া মনে করিবার দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া যায়। তাই অণিমা, নীলিমা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েদের নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়—সাহিত্যের ভাষায়ও কোন কোন স্থলে নীলিমা প্রভৃতির বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলায় স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিলেও স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে একরূপ অকারণেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উদাহরণ—শতবার্ষিকী, স্মৃতিবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, চয়নিকা, চলন্তিকা, রবিদীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে

৬। অবশ্য দুই এক স্থলে যে সে আকারও ব্যবহার করে না, এমন নয়। অপ্রয়োজনেও সে 'আস্পদ' শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে যাইয়া 'আস্পদা' ব্যবহার করিয়া বসে। যথা, শ্রদ্ধাস্পদা, স্নেহাস্পদা প্রভৃতি।

এগুলিকে পুংলিঙ্গ শব্দের বিশেষণরূপেও ব্যবহার করা হয়। যথা, আগমনী গান, জন্মবার্ষিকী উৎসব, সংশোধনী প্রস্তাব। রামেন্দ্রসুন্দর বহু দিন পূর্বে তাঁহার বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে এ জাতীয় প্রয়োগের নিন্দা করিয়াছিলেন—প্রযোক্তাদিগের দণ্ডবিধানেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে, বাঙালী গালভরা শব্দ ব্যবহার করিতে চায়—এজন্য শেষের স্বরকে দীর্ঘ করিতে পারিলে সুবিধা হয় এবং এ সুবিধা স্ত্রীলিঙ্গের ঈ প্রত্যয়ে পাওয়া যায় বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ—এ বিষয়ে সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য।

**তদ্ধিত প্রত্যয়।**—সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে 'ষ্ণিক' নামে প্রচলিত প্রত্যয়টির বহুল ব্যবহার আধুনিক বাংলায় দেখা যাইতেছে। কোন বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে প্রায়শঃ এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে নবগঠিত শব্দগুলির স্থলে এই ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম সাধারণতঃ অনুসৃত হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই প্রত্যয় যোগ করিলে সাধারণতঃ পূর্বপদের প্রথম স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে উভয় পদেরই প্রথম স্বর বা দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। বাংলায় কিন্তু বেশীর ভাগ স্থলেই পরপদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করা হয়। যথা—অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, সমসাময়িক প্রভৃতি। প্রাচীন শব্দের বেলায়ও দুই এক স্থলে এই রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাচীন মতানুসারে ঐহলৌকিক না লিখিয়া কেহ কেহ ইহলৌকিক লিখিয়া থাকেন। অথচ ইংরাজি রীতির অন্ধ অনুকরণে রচিত আন্তর্জাতিক, আন্তঃপ্রাদেশিক প্রভৃতি শব্দে দুই পদেরই বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।

কালবাচক অব্যয় শব্দের পরে বিহিত তন প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় অন্যত্রও ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—ঊর্ধ্বতন, উচ্চতন, পূর্বতন, নিম্নতন প্রভৃতি। আলু ও মতুপ্‌ প্রত্যয়ের ব্যবহারেও এইরূপ ব্যাপকতা লক্ষিত হয়। চলতি উচ্চারণ ও কোন কোন স্থলে মতুপ্‌-প্রয়োগের অনুকূল।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দের পরে 'ভাব'বাচক 'তা' প্রত্যয় বৈয়াকরণের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও অসঙ্কোচে ব্যবহৃত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ভরতা, নিশ্চয়তা, প্রসারতা, উৎকর্ষতা প্রভৃতি প্রয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বিশেষণ শব্দের পরেও ঈকার যোগ বাংলায় কুশলী, সাবধানী প্রভৃতি শব্দে দেখা যায়। সংস্কৃতানুসারে এগুলিকে স্বার্থিক প্রত্যয় বলা চলে অর্থাৎ এগুলি মূল শব্দের নিজের অর্থই প্রকাশ করে মাত্র। অবশ্য বিশেষ্যরূপে বিশেষণের এবং বিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহারও বাংলায় বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। সতত্তা শব্দে শব্দের মূল রূপটিই উপেক্ষিত হইয়াছে। একত্র মিলিত অর্থে একত্রিত শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতের অনুমোদিত না হইলেও বাংলায় বহুল প্রচলিত। গালভরা শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শব্দগুলিকে ফাঁপাইয়া তুলিবার চূড়ান্ত নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

এইরূপ আরও বহু শব্দ ভাষার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের সংকলন ও সমালোচন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত চেষ্টায়ই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। বাংলা ব্যাকরণকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য এ বিষয়ে সুধীসমাজকে অবহিত হইতে হইবে।

# বাংলা সাময়িক-পত্র—৬

১২৮৯—১২৯০ সাল ( এপ্রিল ১৮৮২—এপ্রিল ১৮৮৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**প্রবাহ** ( মাসিক )। ১ বৈশাখ ১২৮৯ ( এপ্রিল ১৮৮২ )।

দামোদর মুখোপাধ্যায় এই মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১ম সংখ্যার সূচনায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :—

"প্রথমতঃ, সময়ের সহিত সাময়িক পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সাময়িক পত্র সমূহ প্রায়ই নিতান্ত অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাতে পাঠকের অতিশয় অপ্রীতি জন্মে, কার্য্যের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয়, এবং উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন ঘটে। আমাদিগের প্রবাহ প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে। সুতরাং অন্য পত্র সমস্ত সত্বেও প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিবে না। প্রবাহ আত্মীয়ের সমাদর বা অনাত্মীয়ের হতাদর করিবে না।...প্রবাহ সম্প্রদায় বিশেষের, মত বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের দাস হইবে না।...প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে। তৃতীয়তঃ, যাহা সাধারণের বোধাতীত, বা যাহা নীরস, বা যাহাতে প্রয়োজন নাই, প্রবাহ কদাপি তাহাতে হস্তার্পণ করিবে না। যাহা সাধারণের কল্যাণকর, যাহার সহিত দেশের বা সমাজের উন্নতির সম্বন্ধ আছে, যাহার সহিত সকলের হিত, আনন্দ, অনুরাগ ও উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রবাহের আলোচ্য হইবে।...চতুর্থতঃ, যে সকল রাজকার্য্যের সহিত সর্ব্বসাধারণের ইষ্টানিষ্টের অধিক সম্বন্ধ দেখিবে প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে।... পঞ্চমতঃ, প্রবাহ সমসাময়িক সমস্ত গণনীয় ঘটনার উল্লেখ বা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। সাহিত্য সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ইতিহাস সম্বন্ধীয় উন্নতি, অবনতি, নবাবিষ্কার, বা মতান্তর্থা প্রবাহ সকলকে জানাইতে যত্ন করিবে। ষষ্ঠতঃ, প্রবাহ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ সমাদর করিবে।...সপ্তমতঃ, নাটক ও অভিনয় সময়ে সময়ে জাতীয় উন্নতি, বা অবনতির প্রধান হেতু হইয়া থাকে। এই জন্য প্রবাহ নাটক ও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয়ের গুণাগুণ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। অষ্টমতঃ, প্রবাহ বিশ্বাস করে যে বঙ্গভাষার এখন নিতান্ত ক্ষীণ অবস্থা। এ সময়ে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যিনি যাহা করেন তাহাই শুভ। এইজন্য প্রবাহ সকল গ্রন্থকারকেই সমাদর করিবে, গ্রন্থের দোষের কথা যেমন বুঝিবে তেমনি সরলভাবে ব্যক্ত করিবে, এবং গুণের কথা সানন্দে প্রচারিত করিবে। কিন্তু কদাপি অকারণ বিদ্রূপ করিয়া কাহাকেও হতোৎসাহ করিবে না, বা মনস্তাপ দিবে না। প্রবাহের এই সকল

সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে প্রবাহের উদ্দেশ্য অনেক ও বহুব্যাপী এবং তৎসমস্ত সাধনোদ্দেশে কোন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

'প্রবাহ' সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র ছিল।

**সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৯ ( মে ১৮৮২ )।

এই মাসিকপত্র ও সমালোচনের সম্পাদক ছিলেন—প্রাণানন্দ কবিভূষণ; ইহা ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক ১ম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

> "বর্ত্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। শীঘ্রও যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমরা ইহার সোপানমাত্র গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য ও কৃতচিত্ত লোকেরা আমাদের এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় অনুবাদমাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অনুবাদিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই সুপ্রতীত হইতে পারে, তজ্জন্য চিত্রাদি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, বিজ্ঞান বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কৃতশ্রম ও কৃতকৃত্য বহুদর্শী ব্যক্তিগণই ইহার লেখক-পদে মনোনীত হইয়াছেন।"

'বিজ্ঞান-দর্পণে' শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের "পাথুরিয়া কয়লা," কালীবর বেদান্তবাগীশের "বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব" প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

**গোপাল ভাঁড়** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৯ ( এপ্রিল ১৮৮২ )।

এই "রহস্য-জনক মাসিক পত্র" কিষণলাল বর্ম্মণের সম্পাদকতায় ৮ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়। সামাজিক কুনীতি নিরাকৃত করা ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

**বার্ত্তাবহ** ( সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"আমরা বার্ত্তাবহ নামক ক্ষুদ্র কলেবরের নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পাবনা হইতে উহা প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

**ঋষিতত্ত্ব** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"ঋষিতত্ত্ব। বেদ, পুরাণ তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীঅন্নদাচরণ সরস্বতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। চট্টগ্রাম চন্দ্রশেখর যন্ত্রে মুদ্রিত। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য দেড়

আনা।...আমরা যত্ন সহকারে ঋষিতত্ত্বের প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। ২।১টী প্রবন্ধ ব্যতীত সমস্তই সারবান ও লেখকের বিদ্যা ও জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। এরূপ সাময়িক পত্রের দীর্ঘ-জীবন আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।"—'প্রবাহ,' আশ্বিন ১২৮৯।

**দর্পণ** ( মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ ( ২ জুন ১৮৮২ )।

কুমিল্লা সুহৃদ্ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত।

**ভারতহিতৈষী** ( পাক্ষিক )। জ্যৈষ্ঠ (?) ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )

"ভারতহিতৈষী নামক একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৪ আষাঢ় ১২৮৯।

**রামধনু** ( সাপ্তাহিক )। জুন ১৮৮২।

"আমরা রামধনু নামক একখানি নূতন পত্রিকার কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। নগদ মূল্য এক পয়সা। ইহাতে শিল্প বিজ্ঞানাদির বিষয় লিখিত হইতেছে। বিষয়গুলি উপকারক।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২১ জুলাই ১৮৮৩।

এই সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র "ঢাকা কলেজের লেবরেটরি এসিস্‌টাণ্ট শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত।" ইহার ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যার তারিখ—জুন ১৮৮৩।

**নবীন** ( মাসিক )। আষাঢ় ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

সম্পাদক—প্রসন্নকুমার গুহ। ইহা ঢাকা গিরিশযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত।

**স্বদেশ সংস্কারক** ( মাসিক )। আষাঢ় ১২৮৯ ( জুলাই ১৮৮২ )।

সম্পাদক—হরিমোহন রায়।

**প্রতিভা** ( সাপ্তাহিক )। আষাঢ় ( ? ) ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"আমরা প্রতিভা নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতি বৃহস্পতিবার ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৭ শ্রাবণ ১২৮৯।

**মাসিক সন্দর্ভ**। শ্রাবণ ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"নূতন পুস্তক।—...মাসিক সন্দর্ভ ( শ্রাবণ ১২৮৯ )—শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৬ শ্রাবণ ১২৮৯।

**প্রতিবাদ** ( মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৯ ( আগস্ট ১৮৮২ )।

সম্পাদক—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

**মালা** ( মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৯ ( জুলাই ১৮৮২ )।

পরিচালক—মাখনলাল দত্ত।

**উষা** ( মাসিক )। শ্রাবণ ( ? ) ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"উষা—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। পাবনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১।০ মাত্র। আমরা ইহার ১ম তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। যে পর্য্যন্ত দেখা গেল অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিরই ভাষা এবং ভাব বেশ সুন্দর হইয়াছে।"—'বামাবোধিনী পত্রিকা,' কার্ত্তিক, ১২৮৯।

সম্পাদক—তারকনাথ অধিকারী।

**ভারতবাসী** ( সাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"আমরা ভারতবাসী নামধেয় একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ২য় সংখ্যা পাইয়াছি। ভারতবাসীর আকার ঠিক বঙ্গবাসীর ন্যায়। মূল্য বঙ্গবাসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।"—'এডুকেকেশন গেজেট,' ৩১ ভাদ্র ১২৮৯।

**বিদ্রূপ** ( সাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৮৯ ( আগস্ট ১৮৮২ )।

সম্পাদক—কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল লাইব্রেরি পত্রিকাখানি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—A new journal apparently intended for the exposure of what is considered by the writers to be current Bengali vices, follies, failings etc.

**দিল্লীকা লাড্ডু** ( মাসিক )। ভাদ্র ১২৮৯ ( সেপ্টেম্বর ১৮৮২ )।

পরিচালক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

**সুরভি** ( সাপ্তাহিক )। ১ আশ্বিন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"বিজ্ঞাপন।—আগামি ১লা আশ্বিন শনিবার হইতে 'সুরভি' নামে একখানি নূতন বিবিধ বিষয়িণী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা 'সুরভি'র উদ্দেশ্য। সকল সংবাদপত্রের ন্যায় ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাব ও নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইবে, এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নানাবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্জক ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুদায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য বিষয় ব্যতীত 'সুরভি'র প্রতি সংখ্যায় একটি চিত্তবিনোদকর ইংরাজী উপন্যাসের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় মহিলাগণের পক্ষে 'সুরভি' পত্রিকা বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তরঞ্জক হইবে এরূপ আশা করা যায়।

আজি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকার কার্য্য সম্পাদিত হইবে। 'সুরভি' রয়াল আকার ৪ পেজি দুই ফরমা হইবে।...শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।"—'বামাবোধিনী পত্রিকা,' আগষ্ট ১৮৮২।

'সুরভি' যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কিছু কাল পরে 'পতাকা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুরভি ও পতাকা' নাম ধারণ করে।

**বঙ্গবন্ধু** ( মাসিক )। অক্টোবর ১৮৮২।

সম্পাদক—রেঃ বরদাচরণ ঘোষ। ইহাতে প্রধানতঃ খ্রীষ্টতত্ত্ব আলোচিত হইত।

**প্রজাবন্ধু** ( সাপ্তাহিক )। আশ্বিন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

এই সুলভ মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র "গোন্দলপাড়া ( ফরাসিস চন্দননগর ) ব্যাস যন্ত্রে" মুদ্রিত হইত। "ইহাতে ফরাসীদিগের অধীনস্থ ভারতের উদারনৈতিক রাজ্যশাসন, পূর্ব্বতন ইতিহাস, আধুনিক অবস্থা প্রকাশিত হয়। ইংরাজদিগের রাজ্যশাসনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, জীবনী, ইতিহাস, সরল বিজ্ঞান, গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি অল্পের মধ্যে অতি সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲।"

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন।

**ইন্দ্রজাল** ( মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"( বিজ্ঞাপন )—ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্যার পুঁথি। সন ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।...ইহাতে বশীকরণ ও দ্রব্যগুণ দ্বারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়াপ্রদর্শনের প্রক্রিয়াসকল লিখিত আছে।...কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ। কলিকাতা, নর্থ সুবার্বন টালা, ২ নং কার্য্যালয়।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ বৈশাখ ১২৯০।

**আর্য্যরঞ্জন** ( মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"আর্য্যরঞ্জন। মাসিক পত্র ও সমালোচন। বরিশাল, সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীদ্বারকানাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড /১০—আশ্বিন ও কার্ত্তিক।"—'প্রবাহ,' মাঘ ১২৮৯।

**জাতীয় সুহৃৎ** ( পাক্ষিক )। আশ্বিন (?) ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"আমরা জাতীয় সুহৃৎ নামক একখানি পাক্ষিক পত্রের কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। জাতীয় সুহৃৎ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

**প্রেমপ্রচারিণী** ( পাক্ষিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ ( ৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ )।

"প্রেম প্রচারিণী নাম্নী একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করা এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ পৌষ ১২৮৯।

**সুখসরোজ** ( মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ ( ডিসেম্বর ১৮৮২ )।

"বিজ্ঞাপন।—'সুখসরোজ' নামক সাহিত্য বিজ্ঞানাদি সম্বলিত মাসিকপত্র গত ডিসেম্বর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১১ মে ১৮৮৩।

**উত্তরবাসিনী** ( মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৯ ( ডিসেম্বর ১৮৮২ )।

সম্পাদক—দ্বারিকানাথ মজুমদার।

**আর্য্যপ্রতিভা** ( মাসিক )। অগ্রহায়ণ (?) ১২৮৯ ( ইং ১৮৮২ )।

"আর্য্যপ্রতিভা। সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীকালীচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।... এই ক্ষুদ্রাকার মাসিক পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।"—'প্রবাহ,' পৌষ ১২৮৯।

**বঙ্গবন্ধু** ( মাসিক )। পৌষ ১২৮৯ ( ডিসেম্বর ১৮৮২ )।

রামচন্দ্র রায় এই পত্রিকাখানি শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করিতেন।

**সখা** ( মাসিক )। জানুয়ারি ১৮৮৩।

প্রমদাচরণ সেন বালক-বালিকাগণের বিবিধ জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। সে-যুগে ইহার খুব আদর হইয়াছিল। আড়াই বৎসর কাগজখানি চালাইবার পর ১৮৮৫ সনের ২১এ জুন, ২৭ বৎসর বয়সে, প্রমদাচরণের মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী জুলাই মাস ( ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ) হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'সখা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ৪র্থ বর্ষের ( ইং ১৮৮৬ ) 'সখা'রও সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর অন্নদাচরণ সেন পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে 'সখা' ভুবনমোহন রায়-পরিচালিত 'সাথী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সখা ও সাথী' নাম ধারণ করে।

**যশোহর প্রবাহ** ( মাসিক )। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

"বিজ্ঞাপন।—'যশোহর প্রবাহ।' মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে যশোহর বরণডালি গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা।—শ্রীশশিভূষণ মোদক। সম্পাদক। যশোহর, ত্রমুহাটী পোস্ট, বরণ্ডালি গ্রাম।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৫ মাঘ ১২৯০।

ইহাও শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

**ভারতদর্পণ** ( সাপ্তাহিক )। ১ ফাল্গুন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮৩ )।

"ভারতদর্পণ ( সংবাদপত্র ) কলিকাতা ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক ভবনস্থ সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিষ্ণু কর্ত্তৃক ৪৬ নং পটুয়াটোলা লেন ভারত দর্পণ কার্য্যালয় হইতে প্রতি সোমবারে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য এক পয়সা।

আমরা এই সুলভ পত্রখানির আবির্ভাবে নিতান্ত প্রীত লইলাম।...এই পত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকাংশে বঙ্গবাসী নামক সংবাদপত্রের ছায়। উভয় পত্রের প্রধান বিভিন্নতা মূল্য। বঙ্গবাসীর মূল্য দুই পয়সা, ভারতদর্পণের মূল্য এক পয়সা।"—'প্রবাহ,' চৈত্র ১২৮৯।

'ভারতদর্পণ' ১লা ফাল্গুন সোমবার প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১২ই ফাল্গুন তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ইহার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

**মুকুলমালা** ( মাসিক )। ফাল্গুন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮৩ )।

"মুকুলমালা।...এই পত্রিকাখানি ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।...ইহাতে পুরাবৃত্ত, পৌরাণিকতত্ত্ব, বৈদিক তথ্য, সুমধুর কবিতা, সুপাঠ্য উপন্যাস, সহজ বিজ্ঞান, এবং বহুবিধ বিষয়ের সমালোচনা প্রভৃতি যথোপযুক্ত লেখক কর্তৃক লিখিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৷০।...শ্রীঅম্বুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কার্য্যাধ্যক্ষ। কাশীকুণ্ডুর ঘাট, ফরাশিশ চন্দননগর।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৬ ফাল্গুন ১২৮৯।

**বসন্ত সমীরণ** ( সাপ্তাহিক )। ফাল্গুন ১২৮৯ ( ইং ১৮৮৩ )।

সম্পাদক—এম. এন. বর্ম্মণ। ইহা সালকিয়া হইতে প্রকাশিত হইত।

**সঞ্জীবনী** ( সাপ্তাহিক )। ৩ বৈশাখ ১২৯০ ( ১৫ এপ্রিল ১৮৮৩ )।

"আমরা সঞ্জীবনী নাম্নী একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি সুপার রয়েল দুই ফরমা। ইহার মূল্যও অতি শস্তা, দুই পয়সা মাত্র। লেখাও প্রথম সংখ্যায় বেশ হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ বৈশাখ ১২৯০।

'সঞ্জীবনী' প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর সুকুল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ বৈশাখ ১২৯০। প্রথম দিকে দ্বারকানাথই প্রধানতঃ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন।

**সময়** ( সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( এপ্রিল ১৮৮৩ )।

"আমরা 'সময়' নামক...নূতন সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সময় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সুপার রয়েল চারি পেজ, মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের নগদ দুই পয়সা।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ বৈশাখ ১২৯০। 'সময়' "রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদ, এবং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।"

**সারস্বত পত্র** ( সাপ্তাহিক ? )। বৈশাখ ( ? ) ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"আমরা সারস্বত পত্র নামক নূতন সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সারস্বত পত্র ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে প্রকাশিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ বৈশাখ ১২৯০।

**বঙ্গমহিলা** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নারীহি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ
তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারী শিক্ষাগরীয়সী॥

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—"জ্ঞানের অধিকার বর্দ্ধন ও গৌরব খ্যাপন ইহার উদ্দেশ্য। বিস্তীর্ণ জগৎ-সংসার আলোকিত করা ইহার সাধ্যায়ত্ত হউক বা না হউক, বাঙ্গালির অন্তঃপুরে যেখানে অজ্ঞানতিমির চিরবিরাজমান, যেখানে তীব্রকর পণ্ডিতগণের বিতরিত জ্ঞানালোক লব্ধপ্রবেশ হয় না. সেই স্থানে থাকিয়া স্বকার্য্যসাধন করিবে।"

**কিরণ** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

ইহা একখানি পদ্যময় মাসিকপত্র, নান্নার ভারত সুহৃৎ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল ৵০। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার পরিচালক হিসাবে কালিশচন্দ্র দে'র নাম আছে।

**হানিমান** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

"সদৃশ-চিকিৎসাবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।" সম্পাদক—বসন্তকুমার দত্ত।

**হোমিওপ্যাথিক প্রচারক** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

সম্পাদক—পূর্ণচন্দ্র সেন।

**বৈষয়িক তত্ত্ব** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

এই মাসিকপত্র তাহিরপুর দাতব্য-কৃষিকার্য্যালয় হইতে রামপ্রসাদ তালুকদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। বঙ্কবিহারী খাঁ ইহা সম্পাদন করিতেন। পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> "সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, সাংসারিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়-কার্য্য সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা ও আন্দোলনের জন্ম এ পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতেছে এবং যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বঙ্গের পার্থিব সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের অধিক দৃষ্টি থাকিবে।"

'বৈষয়িক তত্ত্ব' কিছু দিন পরে ত্রৈমাসিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছিল।

**তরঙ্গিণী** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

সম্পাদক—রামসত্য মুখোপাধ্যায়।

**দ্রব্যগুণতত্ত্ব** ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

**নব্যভারত** ( মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

এই সুপরিচিত মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র প্রচার অব্যাহত রাখেন। সম্বৎসর-মধ্যে তাঁহার

মৃত্যু হইলে ( ১২ ভাদ্র ১৩২৮ ) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে তৎপত্নী কুমুদনলিনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল ( ৪৩শ বর্ষ ) পর্য্যন্ত চলিয়া লুপ্ত হয়।

**কৌমুদী** ( মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ ( মে ১৮৮৩ )।

ইহা সম্পাদন করিতেন—হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

**যোগিনী** ( মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ ( ২৪ মে ১৮৮৩ )।

পরিচালক—উমাশঙ্কর বাগচি।

**ললনা সুন্দরী** ( মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ ( ৪ জুন ১৮৮৩ )।

পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সহচরী** ( মাসিক )। আষাঢ় ১২৯০ ( জুন ১৮৮৩ )।

এই সচিত্র পত্রিকাখানি "শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক যোড়াসাঁকো ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত।"

**কলির নূতন অবতার** ( পাক্ষিক )। আষাঢ় ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

পরিচালক—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

**সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য** ( পাক্ষিক )। আষাঢ় ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

ইহাতে কেবল গল্প-উপন্যাসই স্থান পাইত। পরিচালক—তারকনাথ বিশ্বাস।

**পাক-প্রণালী** ( মাসিক )। আষাঢ় (?) ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

**শক্তি** ( সাপ্তাহিক )। শ্রাবণ ১২৯০ ( জুলাই ১৮৮৩ )।

ইহা ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত।

**ভারতভূমি** ( সাপ্তাহিক )। ১১ শ্রাবণ ১২৯০ ( ২৬ জুলাই ১৮৮৩ )।

"ভারতভূমি—নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র গত ১১ই শ্রাবণ অবধি শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৬ শ্রাবণ ১২৯০।

**হীরাপ্রভা** ( মাসিক )। শ্রাবণ ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

১২৯০, ১৯এ আশ্বিনের 'এডুকেশন গেজেটে' অন্নদাপ্রসাদ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাখানির ১ম ও ২য় সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

**দৈনিক বার্ত্তা** ( প্রাত্যহিক )। ১ আগষ্ট ১৮৮৩।

"বিজ্ঞাপন।—দৈনিক বার্ত্তা। ১লা আগষ্ট হইতে দৈনিক বার্ত্তা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।...অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১২ টাকা।... শ্রীগিরীন্দ্রলাল চৌধুরী। হুগলী।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৩০ আগষ্ট ১৮৮৩।

**উদ্বোধন** ( সাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"উদ্বোধন—নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৯ ভাদ্র ১২৯০।

**নন্দিকেশ্বর** ( মাসিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( আগষ্ট ১৮৮৩ )।

"নন্দিকেশ্বর সচিত্র রহস্যাত্মক মাসিক পত্র ও ব্যঙ্গ সমালোচন। সত্যচরণ গুপ্ত এণ্ড সন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা। প্রতি খণ্ড এক আনা। নন্দিকেশ্বরের উপস্থিত ব্যঙ্গের নমুনাগুলি বাজারে অগ্রাহ্য হইবে না। অনেকেই আদর করিয়া ক্রয় করিতে পারেন।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ ভাদ্র ১২৯০।

সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত।

**আলোক** ( সাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( আগষ্ট ১৮৮৩ )।

"আলোক—সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত, নগদ মূল্য আধ পয়সা। সংবাদপত্র সুলভ হইতে আর বাকি রহিল না।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ ভাদ্র ১২৯০।

**ব্রাহ্মণ** ( মাসিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( আগষ্ট ১৮৮৩ )।

তেজচন্দ্র বিদ্যানন্দের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' ( ৮ ভাদ্র ১২৯০ ) লেখেন :—"আমরা এই আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিকা মাসিক পত্রিকার ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম।"

**বালিকা** ( মাসিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ )।

"বালিকা—নূতন মাসিক পত্রিকা। ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। এখানি প্রধানতঃ বালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত অভিপ্রেত। তদুপযোগী বিষয়গুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯০।

পত্রিকাখানি অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩।

**আন্দোলন** ( মাসিক )। ভাদ্র ১২৯০ ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ )।

ইহা সম্পাদন করিতেন—নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

**কলিকাতার নিগূঢ় তত্ত্ব** ( মাসিক )। আশ্বিন ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

পরিচালক—নন্দলাল সরকার।

**নন্দের চাঁদ** ( মাসিক )। আশ্বিন ১২৯০ ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ )।

ইহাও একখানি হাস্যপ্রধান মাসিকপত্র; পরিচালক—পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।

**ভারতবণিক** ( সাপ্তাহিক )। আশ্বিন ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"ভারতবণিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কলিকাতায় নূতন প্রকাশিত। ইহাতে কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রবন্ধ ও সংবাদাদি প্রকাশিত হইবে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৯ আশ্বিন ১২৯০।

**সংসার** ( সাপ্তাহিক )। আশ্বিন (?) ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"সংসার—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, কলিকাতা কাশীপুর হইতে নূতন প্রকাশিত। কয় সংখ্যার লেখা ভালই বোধ হইল।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১০ কার্ত্তিক ১২৯০।

**বঙ্গবাসিনী** ( সাপ্তাহিক )। কার্ত্তিক ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

ইহা বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে প্রকাশিত হয়। ১২৯০, ১২ই আশ্বিন ( ১৮৮৩, ২৮এ সেপ্টেম্বর ) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' 'বঙ্গবাসিনী'র এই বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয়:—

'বঙ্গবাসিনী

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১॥০ টাকা, মফস্বলে ২।০। আকার দুই ফরমা, ডিমাই এক সিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ। প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

লেখিকাগণ।—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ।

এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন [ কার্ত্তিক ? ] মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে। জ্ঞানী, মানী, ধনী, শিক্ষক, কৃষক, অজ্ঞান, বালক বালিকা, ব্যবসায়ী, স্ত্রী, পুরুষ, সকল শ্রেণীর লোকের জন্য লিখিত এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশসমূহে বামাগণের লিখিত, নানা প্রকার সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার বিশেষ আদর হইয়া থাকে। তবে বঙ্গে আদর না হইবে কেন? বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অশিক্ষিত

লোকশিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, আমা কারণ বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।...শ্রীগিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ। বঙ্গবাসিনী কার্য্যাধ্যক্ষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বণ টালা, ২ নং বঙ্গবাসিনী কার্য্যালয়।"

পরবর্ত্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ ( ৩০ নবেম্বর ) তারিখে 'বঙ্গবাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' এইরূপ লেখেন :—

"বঙ্গবাসিনী ( ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা ) সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনী-গণের হিতোদ্দেশে সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।"

**ঘাঁটাল পত্রিকা** ( পাক্ষিক )। কার্ত্তিক ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"ঘাঁটাল পত্রিকা ; ইহা পাক্ষিক, ইহার ৪র্থ ও ৫ম দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ পৌষ ১২৯০।

**বাল্যবন্ধু** ( মাসিক )। কার্ত্তিক ১২৯০ ( অক্টোবর ১৮৮৩ )।

সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে ছেলেদের খ্রীষ্টতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য পাদরি জে. ই. পেনের (Payne) সম্পাদকত্বে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়।

**কৃষিপদ্ধতি** ( মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"কৃষিপদ্ধতি ( ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা )—এখানি কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা ; বরাহনগর নর্সারি হইতে শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯০।

**পঞ্চপ্রদীপ** ( মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯০ ( ইং ১৮৮৩ )।

"বিজ্ঞাপন।—পঞ্চপ্রদীপ। মাসিক পত্রিকা। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১10। আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ডিমাই তিন ফরমা আকারে 'পঞ্চপ্রদীপ' প্রকাশিত হইবে। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবেন। শ্রীদুর্গাচরণ রায়। ম্যানেজার। ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট। পঞ্চপ্রদীপ আপিস, কলিকাতা।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯০।

'পঞ্চপ্রদীপ' শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

**চশমা** ( মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৯০ ( নবেম্বর ১৮৮৩ )।

ইহা কলিকাতার গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইত।

**বস্তুবিদ্যা** ( মাসিক )। পৌষ ১২৯০ ( ডিসেম্বর ১৮৮৩ )।

হরিপদ চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় ইহা নরগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইত।

**নীহার** ( মাসিক )। পৌষ ১২৯০ ( ডিসেম্বর ১৮৮৩ )।

"প্রাপ্তিস্বীকার।...নীহার ( মাসিক সংবাদপত্র ) ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য নগদ দুই পয়সা। কলিকাতা শ্যামবাজার নীহার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৪ পৌষ ১২৯০।

'এডুকেশন গেজেটে' "মাসিকপত্র"-রূপে 'নীহারে'র উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ; পত্রিকাখানির মূল্য বিবেচনা করিলে ইহাকে "সাপ্তাহিক" বলিয়াই মনে হয়।

**মুসলমান** ( সাপ্তাহিক )। জানুয়ারি ১৮৮৪।

"মুসলমান নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইবার একখানি অনুষ্ঠানপত্র আমরা দেখিলাম। ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইবে। কেবল মুসলমানদিগের নিমিত্ত কোন সংবাদপত্র আমাদের বাঙ্গালায় নাই। প্রস্তাবিত পত্র এই অভাব পূরণের নিমিত্ত প্রচারিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১১ জানুয়ারি ১৮৮৪।

'মুসলমান' যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

**পাক্ষিক সমালোচক** ( পাক্ষিক )। ১ম পক্ষ, ফাল্গুন ১২৯০ ( ইং ১৮৮৪ )।

ইহা একখানি "সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন"; হরিচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

**অদ্ভুত ইন্দ্রজাল** ( মাসিক )। ফাল্গুন ১২৯০ ( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ )।

পরিচালক—গিরীন্দ্রলাল ঘোষ। ইহাতে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের কথাই আলোচিত হইত।

**রত্নসিংহ** ( মাসিক )। ফাল্গুন ১২৯০ ( ৯ মার্চ ১৮৮৪ )।

ইহা কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

* * * *

আমরা ১২৭৫ হইতে ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রগুলির বিবরণ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ করিলাম। যতই অসম্পূর্ণ হউক, ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর পথ সুগম করিবার মানসেই আমি সংগৃহীত উপকরণগুলি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর কিছু কিছু নূতন সংবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে। পাঠকগণ এগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইলে সুখী হইব।

১। **সুলভ সমাচার**—প্রথম প্রকাশ : ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।—১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে ইহা 'কুশদহ ও ভেরি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে।

২। **মদ না গরল?**—নামক মাসিকপত্রখানি প্রকৃতপক্ষে ১২৭৮ সালের (১২৭৯ নহে) বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭১) প্রকাশিত হয়। ভারত-সংস্কার-সভার প্রথম সাম্বৎসরিক বিবরণে ইহার উল্লেখ আছে।

৩। **সঙ্গীত সমালোচনী।**—'ভারত-সংস্কারক' পত্রে (২৭ কার্ত্তিক ১২৮২) প্রকাশিত সঙ্গীতবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্বন্ধে একটি রচনায় এই অংশটি আছে :—"এই সালের [১২৭৯] আশ্বিন মাসে কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় 'সঙ্গীত সমালোচনী' নামে একখানি অভিনব সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাখানি ৬ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে।"

৪। **সর্ব্বার্থ সঙ্কলন** (মাসিক)। ১২৭৯ সাল (ইং ১৮৭২)।

ইহাতে ক্রমান্বয়ে কাব্য, নাটক, পুরাণ, বেদ, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থসকল বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। 'সর্ব্বার্থ সঙ্কলন' বাগবাজার-নিবাসী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সংশোধিত। ১২৭৯ সালে ইহার প্রথম আট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৯, ১লা শ্রাবণ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার ১ম খণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

৫। **মহাপাপ বাল্য বিবাহ**—প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১২৮০।—ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই মাসিকপত্র পরিচালন করিতেন।

৬। **প্রমোদিনী।**—ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন (ফাল্গুন নহে) ১২৮০।

৭। **ভারতদর্পণ প্রকাশিকা।**—ইহা ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। 'ভারত-সংস্কারকে' (১২ বৈশাখ ১২৮১) প্রকাশ :—"আমরা ভারত দর্পণ প্রকাশিকা নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা সাধারণের হিতার্থে বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।"

৮। **বাঁদরামী**—প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১২৮২।—১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে ইহা 'বঙ্গরহস্য The Bengal Punch' আখ্যা ধারণ করে।

৯। **বালকবন্ধু**—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 'প্রচারকগণের সভা'য় ১০ বৈশাখ, সোমবার, ১৮০০ শকের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় :—"বালকদিগের জন্য বালকবন্ধু নামক পাক্ষিক এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য পরিচারিকা (নামক) একখানি মাসিক পত্রিকা

বাহির হইবার প্রস্তাব হইল।"* আমরা ৪র্থ সংখ্যা 'বালকবন্ধু' দেখিয়াছি; উহার প্রকাশকাল—৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ শক, বৃহস্পতিবার। প্রথম সংখ্যা ২০ বৈশাখ (২ মে ১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা। 'বালকবন্ধু' ১৮০৩ শকের ১লা পৌষ (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮১) হইতে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রচারকগণের সভার ১৮০৩ শক, ২১এ অগ্রহায়ণ তারিখের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ:—

> "২। আগামী উৎসবের মধ্যে আশ্রম, স্কুল, বালকবন্ধু প্রভৃতি পুনরায় করিতে হইবে।...
>
> ৪। বালকবন্ধু পত্রিকা পরিচালনের কমিটীর সভ্য শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, দীননাথ চক্রবর্ত্তী, রাজমোহন বসু হইলেন। বালকবন্ধু মাসিক হইল। ১ম খণ্ড ১লা পৌষে বাহির হইবে।"†

মাসিক 'বালকবন্ধু' কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার "নূতন প্রকরণ" মাসিক আকারে ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়; প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা।

১০। **দিবাকর**—'বীরভূম-বিবরণে'র ৩য় খণ্ডে প্রকাশ:—"বীরভূম হইতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম 'দিবাকর' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৮৭৮ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। অল্প দিন পরেই এই পত্রিকা বিলুপ্ত হইয়া যায়।"

১১। **আর্য্য-প্রদীপ**—প্রথম প্রকাশ: কার্ত্তিক ১২৮৫।—এই মাসিকপত্র ১২৮৭ সালে 'আর্য্যপ্রভা' নামে রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১২। **রসিকরাজ:** ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ (বৈশাখ নহে) ১২৮৮।

১৩। **বিশ্বাসী:** ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ভাদ্র (শ্রাবণ নহে) ১২৮৮।

১৪। **উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা** (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)।

"বিজ্ঞাপন।—উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা। সন ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।.. যদি সুলভ মূল্যে উপন্যাস পাঠের আমোদ উপভোগ করিতে চাও, তবে উদাসিনী পাঠ কর। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় রাহাখরচ ১৸৴৹।...কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্বন টালা, ২ নং কার্য্যালয়।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ বৈশাখ ১২৯০।

* 'প্রচারকগণের সভার বা শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ (৫-৮-৭২—৫-১২-১৮৮৩),' ১৩০৭ সাল, পৃ. ৫৮।

† ঐ পৃ. ১২৪।

১৫। **হরিভক্তিতরঙ্গিণী**—এই মাসিকপত্রিকা ১২৮৮ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' (১ চৈত্র ১৮০৩ শক), প্রকাশ:—"আমরা ময়মনসিংহ হইতে হরিভক্তিতরঙ্গিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকার ৩ খণ্ড ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি দ্বারা নববিধান প্রচার করাই লিখকের উদ্দেশ্য।"

---

# ভারতীয় সূর্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগে প্রচলিত সূর্য্যোপাসনার ধারাকে মোটামুটি দুটি পর্ব্বে ভাগ করা চলে। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত সৌর ধর্ম্ম এর প্রথম বা বৈদিক পর্ব্ব। পরবর্ত্তী কালে (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক হইতে) সূর্য্যপূজার এক নূতন পদ্ধতি পারস্য থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উক্ত নব ধারার প্রবর্ত্তক ছিলেন—প্রাচীন পারস্যের ম্যাগি (Magi) পুরোহিত সম্প্রদায়, ভারতীয় ঐতিহ্যে যাঁরা মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে এই বিদেশী পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে এবং সূর্য্যপূজার নূতন ঐতিহ্য এদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়। বিদেশী-প্রভাব-পুষ্ট সূর্য্যোপাসনার উল্লিখিত নব রূপ ভারতীয় সৌর ধর্ম্মের দ্বিতীয় পর্ব্ব। আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্যপূজার এই বহিরাগত নূতন অধ্যায়ের প্রতি ভারতীয় জনমানস বিশেষ কোনও বিরূপতা প্রদর্শন করেনি। স্বর্গীয় অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে তা লক্ষ্য করে বলেছেন[১] "......it (অর্থাৎ সূর্য্যপূজার উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্ব্ব) was accepted by the mass of the Hindus as a general worship of the sun and the feelings which it evoked, could not have been different from those which the indigenous worship (অর্থাৎ প্রথম বৈদিক পর্ব্ব) gave rise to." এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, সূর্য্যপূজার উক্ত দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় লোকমানস, কোনও পার্থক্য অনুভব করেনি কেন? দুই অধ্যায়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ কোনও যোগসূত্র নিশ্চয় ছিল, যার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যে অন্যতম প্রধান আরাধ্য দেবতা হিসাবে সূর্য্যের যে স্বরূপ-বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে স্থানে স্থানে সূর্য্যকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি-আরোগ্যকারিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলস্থ নিম্নলিখিত তিনটি ঋক্ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ[২]—

> "উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্
> হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয়।
> শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি
> অথ হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি।

---

১। Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems (Poona 1928) p. 221.

২। ঋগ্বেদ ১, ৫০, ১১-১২-১৩।

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন মহসা সহ
দ্বিষংতং মহ্যং রংধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম ।"

"হে অনুকূল দীপ্তিযুক্ত সূর্য্য ! অদ্য উদয় হইয়া এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিয়া আমার হৃদ্‌রোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর। আমি আমার হরিমাণ রোগ শুক ও শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করি; আমার হরিমাণ রোগ হরিতাল বৃক্ষে স্থাপন করি। এই আদিত্য সমগ্র তেজোরাশির সহিত উদিত হইয়াছেন; তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ) বিনাশ করিয়াছেন; আমি সেই অনিষ্টকারীর হিংসা করিতেছি না," (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ, সায়ণের ভাষ্য অনুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে গ্রহণ করেছি)। এখানে সূর্য্যকে হৃদ্‌রোগ ও হরিমাণ, এই দুই প্রকার ব্যাধির নাশকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। টীকাকার সায়ণের মতে হৃদ্‌রোগ দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনও প্রকার রোগ (হৃদ্‌রোগং হৃদয়গতম্ আন্তরং রোগং) এবং হরিমাণ শরীরের স্বাভাবিক কান্তিবিনাশী কোনও বাহ্য ব্যাধি, সম্ভবতঃ কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ (হরিমাণং শরীরগতং কান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং)। উক্ত টীকাকার আরও বলেছেন যে, উদ্ধৃত শ্লোক তিনটি একত্রে একটি "ত্রিচ" (বা Triplet) রূপে পরিচিত, এবং রোগমুক্তির জন্য সূর্য্যের উদ্দেশ্যে ঐ ত্রিচ পাঠ করা বিধেয়। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্কণ্ব মুনির রোগমুক্তির উপাখ্যান উদাহরণ-স্বরূপ বিবৃত করেছেন। এক বার প্রস্কণ্বের চর্ম্মরোগ জন্মায়। তিনি উল্লিখিত তৃচের দ্বারা সূর্য্যের আরাধনা করে চর্ম্মরোগ হতে মুক্তি পান (অংত্যস্তৃচো রোগঘ্ন উপনিষদিতি। যুক্তং চৈতৎ। যস্মাদনেন তৃচেন ত্বগ্‌দোষশাংতয়ে প্রস্কণ্বঃ সূর্য্যমস্তৌৎ তেন তৃচেন স্তুতঃ সূর্য্যস্তমৃষিং রোগান্নিরগময়ৎ তস্মাদিদানীমপি রোগশাংতয়েঽনেন তৃচেন সূর্য্য উপাসনীয়ঃ)। দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং দুঃস্বপ্ন দূরীকরণার্থে সূর্য্যের অর্চ্চনার দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদের অন্যত্রও দেখা যায়[৩]।

"যেন সূর্য্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ দুঃষ্বপ্ন্যং সুব।"

"হে সূর্য্যদেব! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর। আমাদিগের পাপ রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর কর" (রমেশচন্দ্র দত্তকৃত অনুবাদ)।

এই প্রসঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের যুগল দেবতা অশ্বিদ্বয়ের কথা উত্থাপিত করা যেতে পারে। বৈদিক যুগে এঁদের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এক মত অনুযায়ী এঁরা সূর্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এমন কি, সূর্য্যের অংশবিশেষ ছিলেন। জনৈক পাশ্চাত্য বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন[৪]—The Asvins may originally have been conceived as finding and restoring or rescuing the vanished light of the sun." পরবর্ত্তী কালের পৌরাণিক ঐতিহ্যেও সূর্য্যের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ

৩। ঋগ্বেদ, ১০. ৩৭. ৪।

৪। Macdonell : Vedic Mythology, p. 5.

ছিল। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে উক্ত দেবতাযুগল বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে জাত দুই পুত্র। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যেও এঁরা দুজনে সৌর দেবতারূপে কল্পিত হয়েছিলেন, এই মত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বৈদিক সাহিত্যে অশ্বিদ্বয় যুগল রোগ-চিকিৎসক দেবতারূপে কল্পিত ও বর্ণিত হয়েছেন।[৫] পৌরাণিক ঐতিহ্যেও সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের যুগল বৈদ্য হিসাবে প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক সাহিত্যে কোনও কোনও স্থলে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এঁরা এঁদের পিতা সূর্য্যকর্ত্তৃক দেবলোকের ভিষক্ নিযুক্ত হয়েছিলেন[৬]

"অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহাত্মনা।"

প্রাচীন ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পেও সূর্য্যের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যপুরাণে সূর্য্যের মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সূর্য্যমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে অশ্বিদ্বয়ের মূর্ত্তি স্থাপিত করা যেতে পারে[৭]

"অশ্বিনৌ চাপি সূর্য্যস্য পার্শ্বয়োরুভয়োঃ স্থিতৌ।
অশ্বরূপাৎ সমুৎপন্নৌ তেন তাবশ্বিনৌ স্মৃতৌ॥"

এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় (বিশেষতঃ উত্তরভারতীয়) সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি লক্ষ্য করলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট সূর্য্যপুত্র অশ্বমুখ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়।[৮] সুতরাং বেদোত্তর ঐতিহ্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সৌরদেবতা বলে মেনে নিতে বিশেষ বাধা থাকে না।

অতএব দেখা গেল যে, সূর্য্যকে রোগ-বিমোচকরূপে কল্পনা ও অর্চ্চনা করবার রীতি বৈদিক সূর্য্যোপাসনার অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। অশ্বিদ্বয়ের সূর্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মরণ রাখলে, এ কথাও মানতে হয় যে, কেবল সূর্য্যদেব নন, তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোনও কোনও দেবতাও রোগ-বিনাশী চিকিৎসকরূপে বৈদিক যুগে পূজিত হতেন।

প্রাচীন পারস্যের সূর্য্যোপাসক ম্যাগি (Magi) পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাংশ ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার পর থেকে ভারতীয় সৌরধর্ম্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুরু। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শক-কুষাণ অধিকারের যুগে এঁরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে, এই আগমনকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক।[৯] সম্ভবতঃ এরও কিছু কাল পূর্ব্বে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগেই ভারতের মাটিতে এঁরা

---

৫। ঋগ্বেদ ১. ১১৬. ১৬; ৮. ১৮. ৮; ৮. ২২. ১০; ১০. ৩৯. ২; অথর্ব্ববেদ ৭. ৫৩. ১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩. ১. ২. ৩।

৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৮. ২৯ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা সং, পৃঃ ১১৮)।

৭। ভবিষ্যপুরাণ ১. ১২৪. ২০ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১১০)।

৮। Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, Vol. I, Pt. II, pp. 314-15.

৯। D. R. Bhandarkar : Foreign Elements in the Hindu Population (Bombay 1910) p. 12.

প্রথম পদক্ষেপ করেন; কেন না, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এঁদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই বিদেশী পুরোহিতগণ মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। তাঁদের আগমনের স্মৃতির ছাপ সুস্পষ্টভাবে রয়ে গিয়েছে পৌরাণিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণে। অধুনা প্রচলিত ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম, মধ্যম, প্রতিসর্গ এবং উত্তর, এই চারটি পর্ব্বে বিভক্ত। এগুলির মধ্যে শেষ তিনটি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম বা ব্রাহ্মপর্ব্ব সম্পর্কে এ কথা খাটে না, এই অংশটি বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রাচীন। ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা অনুমান করেন যে, এই পর্ব্বটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বেই রচিত হয়েছিল।[১০] সৌভাগ্যক্রমে ম্যাগি পুরোহিতগণের ভারতে আগমনের কাহিনী ব্রাহ্মপর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং সে কাহিনী যে মূল্যবান্, তাতে সন্দেহ নেই। খুঁটিনাটি বাদ দিলে ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই বিষয়ক উপাখ্যানটি যা দাঁড়ায়, তা হল এই[১১]: মগব্রাহ্মণগণ মূলতঃ *ছিলেন শাকদ্বীপের অধিবাসী। মিহির গোত্র-সম্ভূত ঋজিহ্ব নামক ঋষির কন্যা নিক্ষুভার* গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে জলগম্বু বা জরশব্দ নামক এক পুত্র জন্মায়। সূর্য্য ও নিক্ষুভার এই পুত্রই মগ সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ। একবার শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্ব্বাসা ও তাঁর পিতা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পর পর প্রদত্ত অভিশাপের ফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। নারদের নিকট সূর্য্যমহিমা শ্রবণ করে তিনি সূর্য্যের আরাধনা করেন ও সূর্য্যের অনুগ্রহে কুষ্ঠব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তিনি চন্দ্রভাগা নদীর (বর্ত্তমান পাঞ্জাবের ঐ নামের সুপরিচিত নদীর) তীরে একটি সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মন্দিরে পুরোহিতের কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ এদেশে সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল না। অবশেষে তিনি সূর্য্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণগণের দেশ শাকদ্বীপে গমন করেন এবং এই বিদেশী সৌর পুরোহিতবর্গের মধ্য হতে আঠারোটি পরিবারকে সঙ্গে করে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) নিয়ে আসেন। এঁদের দ্বারা তাঁর সূর্য্যমন্দিরের পৌরোহিত্যকর্ম্ম উপযুক্তভাবে সম্পাদিত হয়। শাম্ব কর্ত্তৃক ভারতে আনীত মগ পুরোহিতগণ দ্বারকায় ভোজবংশের কন্যাগণের মধ্য হতে পত্নী গ্রহণ করে এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন।" কৃষ্ণপুত্র শাম্বের এই উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বরাহ-পুরাণে স্থান পেয়েছে। যদিও সেখানে মগব্রাহ্মণগণের কোনও উল্লেখ নেই, তবু কৃষ্ণের অভিশাপে শাম্বের দেহে কুষ্ঠরোগ সঞ্চার ও সূর্য্যোপাসনান্তে তাঁর রোগমুক্তির যে বিবরণ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ। ভবিষ্যপুরাণের উপরিউক্ত শাম্বোপাখ্যান যে বরাহপুরাণের শাম্বোপাখ্যানের মূল, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না,

১০। R. C. Hazra : Studies in the Puranic Records of Hindu Rites and Customs, pp. 170-72.

১১। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব, অধ্যায় ১২৭ থেকে ১৪৯ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ, বোম্বাই, পৃঃ ১১৩-৩৩)।

বরাহপুরাণের ঐ উপাখ্যান অংশে দুই বার ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ আছে, যথা—নারদ শাম্বকে বলছেন,

"ভবিষ্যৎপুরাণমিতি তব বাদাদ্ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মলোকে পঠিষ্যামি ব্রহ্মণোঽগ্রে স্বহং সদা।
সুমন্তুর্মর্ত্যলোকে চ মনোঃ প্রকথয়িষ্যতি॥"

আবার বরাহ বলছেন

"শাম্বস্তু সহ সূর্য্যেণ রথস্থেন দিবানিশম্।
রবিং প্রপচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্।
ভবিষ্যৎপুরাণমিতি খ্যাতঙ্কৃত্বা পুনর্নবম্।
শাম্বঃ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠাঞ্চ কারয়ামাস তত্ত্ববিৎ॥"[১২]

বিহার প্রদেশস্থ গয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত গোবিন্দপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে আমরা শাম্ব ও মগব্রাহ্মণগণের কাহিনীর উল্লেখ পাই। এর দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে[১৩]—

"দেবো জীয়াত্রিলোকীমণিরয়মরুণো যন্নিবাসেন পুণ্যঃ
শাকদ্বীপস্স দুগ্ধাম্বুনিধিবলয়িতো যত্র বিপ্রা মগাখ্যা।
বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততনোর্ভাস্বতঃ স্বাঙ্গ (মুক্তঃ)
শাম্বো যানানিনায় স্বয়মিহ, মহিতাস্তে জগত্যাং জয়ন্তি॥"

"ত্রিভুবনের রত্নস্বরূপ সেই দেব অরুণের জয় হোক, যাঁর নিবাসহেতু দুগ্ধসাগরপরিবেষ্টিত শাকদ্বীপ, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মগ নামে আখ্যাত, পবিত্র হয়েছে। সেখানে ভ্রমিযন্ত্রের ঘর্ষণে মুক্ত, স্বয়ং সূর্য্যের অঙ্গ হতে এক দ্বিজবংশের উদ্ভব হয়; এঁরা স্বয়ং শাম্বকর্ত্তৃক এখানে আনীত হন। তাঁরা মহান্, তাঁরা জগতে সম্মানিত।" স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যপুরাণের পূর্ব্বকথিত শাম্বোপাখ্যানের এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। গোবিন্দপুর শিলালেখখানি একটি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশের প্রশস্তি এবং এর রচয়িতা গঙ্গাধরও সেই বংশজাত। মগব্রাহ্মণগণের শাকদ্বীপ হ'তে ভারতবর্ষে প্রবেশের কাহিনী যে ঐতিহ্যরূপে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল, এই শিলালিপি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শাকদ্বীপ পুরাণোক্ত সপ্ত দ্বীপের মধ্যে অন্যতম। এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বহু তর্কবিতর্কের পরে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, প্রাচীন Scythian বা শকজাতির নাম থেকেই শাকদ্বীপের নাম হয় এবং পুরাণে বর্ণিত শাকদ্বীপ প্রাচীন শকস্থান বা ইরাণের অন্তর্গত আধুনিক সিস্তান হতে অভিন্ন।[১৪] উক্ত শাকদ্বীপ যে সূর্য্যপূজার একটি প্রধান

---

১২। বরাহপুরাণ ১৭৭, ৩৪, ৫০, ৫১ (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃঃ ৯৯৪, ৯৯৬)।

১৩। Epigraphia Indica, vol. II, p. 333.

১৪। H. C. Raychaudhuri : Studies in Indian Antiquities, p. 68.

কেন্দ্র ছিল, নানা পুরাণে নানা ভাবে বার বার তা বলা হয়েছে।[১৫] মগসম্প্রদায় সেখানকার ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে মহাভারত পুরাণাদিতে বর্ণিত হয়েছেন।[১৬] পারস্যের সূর্য্যোপাসক ম্যাগি পুরোহিত সম্প্রদায় এই ভাবে শাকদ্বীপস্থ মগব্রাহ্মণ সম্প্রদায়রূপে ভারতীয় ঐতিহ্যে স্থান লাভ করেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পারসীক মতে সূর্য্যোপাসনা এদেশে প্রবেশ করেছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে, কণিষ্ক প্রভৃতি কুষাণরাজগণের মুদ্রাতে প্রাচীন ইরাণের সূর্য্যদেবতা "মিয়িরো" বা "মিহিরে"র (মূল "মিথ্র") নাম ও প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়।[১৭] সম্ভবতঃ এই সময়েই উক্ত বিদেশী সূর্য্যদেবতার পূজাপদ্ধতি সহ তাঁর পূজারী মগপুরোহিতগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। এঁদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতক নাগাদ সমগ্র উত্তরভারতে এই বিদেশী পুরোহিতগণ মারফৎ ইরাণীয় পদ্ধতির সূর্য্যোপাসনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জ্যোতিষী বরাহমিহির, কয়েকটি দেবদেবী ও তাদের পূজক বিশিষ্ট কতগুলি সম্প্রদায়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে সূর্য্যের উপাসকরূপে মগব্রাহ্মণগণকেই নির্দ্দিষ্ট করেছেন, যথা[১৮]

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্
মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু-
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া॥"

বরাহমিহিরের উক্তি মগসম্প্রদায়ের প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রমাণ করে।

স্বভাবতঃই ইরাণীয় সূর্য্যোপাসনার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ম্যাগি পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছিল। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পারস্যে প্রাচীন কালে কুষ্ঠব্যাধিকে সূর্য্যের অভিশাপজনিত বলে মনে করা হত এবং এই উৎকট রোগের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সূর্য্যদেবকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হত। এই মনোভাবের খানিকটা আভাস পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাসের সাক্ষ্যে। তাঁর ভাষায়,[১৯] "A leprous Persian must neither enter the city, nor have

১৫। বিষ্ণুপুরাণ ২, ৪, ৭১ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ২৪২); ব্রহ্মপুরাণ ৩২, ৮০-৮১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৫৩); মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১০৬, ৪১ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা সং, পৃঃ ১৪৯) ইত্যাদি।

১৬। মহাভারত (পুণা সং) ৬, ১২, ৩৩; বিষ্ণুপুরাণ ২, ৪, ৬৯-৭০ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ২৪২); ব্রহ্মপুরাণ ২০, ৭১, ৭২, (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭); অগ্নিপুরাণ ১১৯, ১৮-২১ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ৩৪৫); কূর্ম্মপুরাণ ১, ৪৮, ৩৬-৩৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২১২-১৩); ভবিষ্যপুরাণ ১, ১৩৯, ৭৩-৭৪ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১২৪)।

১৭। Gardner: The Coins of Greek and Scythic Kings of Bactria and India in the British Museum, pp. 131, 134, 141-43, 155 etc.

১৮। বৃহৎসংহিতা ৬০, ১৯ (কার্ণ সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩২৮-২৯)।

১৯। Herodotus I. 138 (Eng. Trans by Below, Vol I, p 142.)

communication with any of his countrymen ; this disease they always think occasioned by some offence committed against the sun." কুষ্ঠরোগ হতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত সূর্য্যতুষ্টির যে বিধি প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে ভবিষ্য ও বরাহ পুরাণদ্বয়ের শাম্বোপাখ্যানের সাধারণভাবে মিল আছে। শাম্বকেও কুষ্ঠরোগমুক্তির জন্য সূর্য্যার্চ্চনা করতে হয়েছিল, এবং সূর্য্যমন্দিরে পৌরোহিত্য করবার নিমিত্ত পারস্য হতে সৌরপুরোহিত আমদানী করতে হয়েছিল। এই বিদেশী পুরোহিতগণ তাদের দেশের প্রথানুযায়ী সূর্য্যকে রোগবিনাশী, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগবিনাশী-রূপে অর্চ্চনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এঁদের প্রভাব উত্তরভারতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায়, উক্ত বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। ফলে ভারতীয় সৌরধর্ম্মের দ্বিতীয় পর্ব্বে সূর্য্যদেবের রোগহর, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগহর স্বরূপের উপর বিশেষ করে জোর দেবার মনোবৃত্তি উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে লক্ষিত হয়।

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে এবং কোনও কোনও খোদিত লিপিতে এই দ্রুতবিস্তারী নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থেকে গিয়েছে। কোথাও সূর্য্য আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, কোথাও সাধারণভাবে রোগবিনাশী, কোথাও বা তিনি বিশেষরূপে কুষ্ঠরোগহররূপে বর্ণিত হয়েছেন। সূর্য্য কারও উপর কুপিত হলে, তার সাধারণ ভাবে রোগ জন্মাবে বা বিশেষ ভাবে কুষ্ঠরোগ তাকে আক্রমণ করবে, এইরূপ উক্তিরও অভাব নেই। মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের মুখে যে সুদীর্ঘ সূর্য্যস্তুতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয়েছে যে, সূর্য্যের ভক্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ হতে মুক্ত হন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেন[২০]

"ন তেষামাপদঃ সন্তি নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা।
যে তবানন্যমনসা কুর্ব্বন্ত্যর্চ্চনবন্দনম্॥
সর্ব্বরোগৈর্ব্বিরহিতাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ।
ত্বদ্ভাবভক্তাঃ সুখিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ॥"

রামায়ণে দেখা যায়, রাম যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের অমিত পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, অগস্ত্যের উপদেশে, সূর্য্যের উদ্দেশ্যে "আদিত্য-হৃদয়" মন্ত্র পাঠ করেন এবং ফলে সূর্য্যের অনুগ্রহ লাভ করে বলশালী হন। উক্ত মন্ত্রে সূর্য্যকে 'আয়ুর্ব্বর্দ্ধক' বলে অভিহিত করা হয়েছে[২১]

"চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্।"

এই জাতীয় বর্ণনা পুরাণগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভবিষ্য ও বরাহপুরাণ-দ্বয়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েছে এবং পরেও সে প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করা হবে। অন্যান্য পুরাণের মধ্যে এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের সাক্ষ্য সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যোপাসনার ফলাফল নিরূপণ প্রসঙ্গে এই পুরাণ বলছে[২২]

২০। মহাভারত, ৩, ৩, ৬৫-৬৬।

২১। রামায়ণ ৬, ১০৬, ৫।

২২। ব্রহ্মপুরাণ ২৮, ৪১ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৩৫ )।

"রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বিদ্যার্থী লভতে ধনম্।"

অন্যত্র এই পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভক্তিভরে সূর্য্যের উপাসনা করলে, উপাসকের বংশে দরিদ্র বা রুগ্ন ব্যক্তি জন্মায় না[২৩]

"ন কুলে জায়তে তেষাং দরিদ্রো ব্যাধিতোঽপি বা।"

সূর্য্যমহিমা শ্রবণের ফলে রোগমুক্তি ঘটে, এ কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঐ গ্রন্থে অন্য এক স্থানে[২৪]

"মুচ্যেতার্ত্তস্তথা রোগাচ্ছ্রুত্বেমামাদিত্যকথাম্।
জিজ্ঞাসুর্লভতে জ্ঞানং গতিমিষ্টাং তথৈব চ॥"

অন্যত্র ঐ একই পুরাণে সূর্য্যবন্দনার মধ্যে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে[২৫]

"নমো নমো রোগবিমোচনায়।"

আয়ুর্বর্দ্ধক এবং রোগনাশকরূপে সূর্য্যের চিত্র মার্কণ্ডেয় পুরাণেও অতি স্পষ্ট। উক্ত পুরাণে (অধ্যায় ১১০) দমের পুত্র রাজা রাজ্যবর্দ্ধনের উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে। সূর্য্যের বরে এঁর আয়ু দশ সহস্র বৎসর বৃদ্ধি পায় এবং এঁর আত্মীয়, বন্ধু, প্রজা, ভৃত্য, সকলেরই আয়ু অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। সূর্য্য তাঁকে এ অনুগ্রহও করেন যে, উক্ত দশ সহস্র বৎসরের মধ্যে তিনি কোনও রোগ ভোগ করবেন না[২৬]

"দশসহস্রবর্ষাণি যথাহং স্থিরযৌবনঃ।
তস্য প্রসাদাদ্দেবস্য জীবিষ্যামি নিরাময়ঃ॥"

সূর্য্যকে রোগ-বিমোচকরূপে চিন্তা করবার যে মনোভাবটি ভারতে ক্রমশঃ বহুলপ্রচলিত হচ্ছিল, মার্কণ্ডেয় পুরাণের সমগ্র ১১০তম অধ্যায়টি এক হিসাবে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ অধ্যায়ের শেষাংশে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সূর্য্যমহিমাশ্রবণকারীর রোগ জন্মায় না[২৭]

"অরোগী ধনবানাঢ্যঃ কুলে মহতি ধীমতাম্।
জায়তে চ মহাপ্রাজ্ঞো যশ্চৈতদ্ধারয়েদ্বুধঃ॥"

পদ্মপুরাণে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের বন্দনার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে যেখানে সাধারণভাবে সূর্য্যের রোগনাশকত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই সকল স্থান থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।[২৮] সূর্য্যের উপাসনার দ্বারা লোক সর্ব্বরোগ হ'তে মুক্ত হয়—

"অস্যোপাসনমাত্রেণ সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে।"

---

২৩। ব্রহ্মপুরাণ ২৯, ৩৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৩৯)।

২৪। ব্রহ্মপুরাণ ৩১, ৯০ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৪৭)।

২৫। ব্রহ্মপুরাণ ৩৩, ২২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৫৯)।

২৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১০, ২২ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা সং, পৃঃ ১৫৪)।

২৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১০, ৩৮ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা সং, পৃঃ ১৫৫)।

২৮। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৭৭, ১৬, ৬৪, ৬৮, ৭৪, ৮৩; সৃষ্টিখণ্ড, ৭৮, ৭, ২২, ২৮, ৩৬, ৫১, ৫৩-৫৪, ৫৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৭৯২, ৭৯৫-৯৬, ৭৯৯-৮০২)।

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে সূর্য্যের অর্চ্চনা সর্ববিধ রোগের সংহারক—

"যচ্চ তত্র কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ ভাস্করী হন্তু সপ্তমী॥"

ঐ দিবস সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদানে ব্যাধির যাতনা দূর হয়—

"সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং যাতি সপ্তজন্মকৃতং চ যৎ।
নরকৈঃ (?) পীড্যতে তাবদ্রোগৈঃ পাপৈশ্চ দুঃখদৈঃ॥"

এবং সূর্য্যের প্রসাদে আরোগ্য ও সম্পদ্ লাভ হয়—

"তথা স্বয়ং সুখং ভোগ্যং লভতে দিবি শাশ্বতম্।
আরোগ্যং সম্পদং লক্ষ্মী ভাস্করস্য প্রসাদতঃ॥

মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে বিজয়াব্রতোপলক্ষ্যে (রবিবার ভিন্ন অন্য দিবসে মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি বিজয়া নামে পরিচিত) সূর্য্যের প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দানাদি করলে, নীরোগ হওয়া যায়—

"অরোগী সুপ্রসন্নাত্মা দস্যুজেতা প্রতাপবান্।
যাবৎ প্রভাসতে ভানুস্তাবৎ পূজ্যতমো হি সঃ॥"

সূর্য্যের আরাধনার উদ্দেশ্যে রবিবার ব্রত পালনের ফলাফল বর্ণনপ্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, রবিবারব্রত স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্যদায়ক, মোক্ষপ্রদ ও রোগবিনাশক—

"সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যমৈশ্বর্য্যং রোগনাশনম্।
স্বর্গদং মোক্ষদং পুণ্যং রবের্বারে ব্রতং হিতম্॥"

সূর্য্য সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ববিঘ্ননাশন এবং সর্ব্বরোগপ্রশমন—

"সর্ব্বঞ্চ পরমঞ্চৈব সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
সর্ব্বরোগপ্রশমনং সর্ব্বার্থপ্রতিসাধকম্॥"

সূর্য্যের দ্বাদশ রূপ, দ্বাদশাদিত্যের স্তুতিপাঠকারীকে রোগযাতনা ভোগ করতে হয় না—

"য ইদং পঠতে নিত্যং তস্য পাপং ন বিদ্যতে।
ন রোগো ন চ দারিদ্র্যং নাবমানো ভবেৎ কচিৎ॥
... ... ... ... ... ...
নামান্যেতানি সূর্য্যস্য শুচির্ভূত্বা পঠেন্নরঃ।
সর্ব্বপাপাচ্চ রোগাচ্চ মুক্তো যাতি পরাং গতিম্॥"

সূর্য্যমন্ত্রজপের ও সূর্য্যাবর্ত্তোদক (সূর্য্যোপাসনা বা সৌরব্রতে ব্যবহৃত মন্ত্রপূত জল ?) গ্রহণের প্রত্যক্ষ ফল তৎক্ষণাৎ রোগমুক্তি, এক কথায়, সূর্য্যদেব তুষ্ট হলে ব্যাধি ভক্তের কাছে ঘেঁসতে পারে না—

"সূর্য্যাবর্ত্তোদকং যস্তু গৃহীত্বা তু ক্রমেণ তু।
তস্য প্রাশনমাত্রেণ নরো রোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
... ... ... ... ...
কটুতৈলসমাযুক্তং নস্যে পানে চ দাপয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তজলং পুত্র সর্ব্বরোগাদ্বিমুচ্যতে।

মূলমন্ত্রস্তু জপ্তব্যঃ সন্ধ্যায়াং হোমকর্ম্মসু ।
জপ্যমানে তু নশ্যন্তি রোগাঃ ক্রূরগ্রহাস্তথা ॥
... ... ... ... ...
শরীরারোগ্যকৃচ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশস্করঃ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো যস্তু তুষ্যেদ্দিবাকরঃ ॥"

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বর খণ্ডে দেখা যায়, সূর্য্য স্বয়ং নারদকে বলছেন যে, তাঁর ( সূর্য্যের ) প্রতি ভক্তি থাকলে এবং তাঁর দর্শন লাভ করলে, তাঁর উপাসকগণের ব্যাধি দারিদ্র্য ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং তাঁর নাম জপের ফলস্বরূপ তাঁরা সর্ব্ববিধ রোগ হতে মুক্ত হয়ে শতায়ু হ'ন[২৯]

"দর্শনান্মম ভক্ত্যা চ নাশো ব্যাধিদারিদ্র্যয়োঃ ।
প্রণামাৎ স্বর্গমাপ্নোতি শ্রুত্বা মোক্ষং চ নিত্যশঃ ॥
... ... ... ... ... ...
ভবেদ্বর্ষশতায়ুশ্চ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ ।
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা প্রযতঃ শুচিঃ ॥"

মৎস্যপুরাণে দেখতে পাওয়া যায়, শিবের মুখ দিয়ে কতগুলি সৌরব্রতের ব্যাখ্যান দেওয়ানো হয়েছে। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি ( বিশেষতঃ মাঘ মাসের ) পৌরাণিক সৌর ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং ঐ তিথিতে সূর্য্যকে নানাভাবে অর্চ্চনা করবার প্রয়োজনীয়তা ও তজ্জনিত পুণ্যের কথা শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত কল্যাণ-সপ্তমী, বিশোক-সপ্তমী, ফল-সপ্তমী, শর্করা-সপ্তমী, কমল-সপ্তমী, মন্দার-সপ্তমী, শুভ-সপ্তমী প্রভৃতি ব্রত, উক্ত পুণ্য সপ্তমী তিথিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, এগুলির মধ্যে প্রথম চারটির এবং শেষ ব্রতটির ক্ষেত্রে উক্ত পুরাণে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই সকল সৌরব্রত পালন করলে সর্ব্বপ্রকার রোগের কবল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কেবলমাত্র কমল-সপ্তমী এবং মন্দার-সপ্তমী, এই দুটি অনুষ্ঠানের বেলায়, উক্ত প্রকার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু অপর পাঁচটির সাক্ষ্যই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।[৩০] অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণগ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও ( রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দী ? ) সূর্য্যদেবের রোগহর স্বরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুরাণকারের মতে জ্বরসংগ্রাহক প্রমুখ সূর্য্যের নামগুলি জপ করলে ব্যাধি প্রশমিত হয়[৩১]

"জ্বরসংগ্রাহকশ্চেতি সূর্য্যনামশতং পরম্ ।
সর্ব্বজ্বরপ্রশমনং সর্ব্বব্যাধিমহৌষধম্ ॥"

২৯। স্কন্দপুরাণ,—মাহেশ্বর খণ্ড, ২, ৪৪, ৩৭-৪০ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৬৬-৬৭ )।

৩০। মৎস্যপুরাণ—৭৩, ১৮ ; ৭৪, ১০ ; ৭৫, ১৩ ; ৭৬, ১৫ ; ৭৯, ১ ( জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৪ )।

৩১। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ—উত্তর খণ্ড, ১১, ১৬ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩২৬ )।

এ যাবৎ মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি থেকে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে সূর্য্য সাধারণভাবে রোগ-হররূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু তা ছাড়াও প্রাচীন পারস্যে যে ভাবে রোগকে, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগকে, সূর্য্যের অভিশাপজনিত বলে মনে করা হত, সেই জাতীয় মনোভাবের সূচক উক্তিও কোনও কোনও পুরাণে দেখতে পাওয়া যায়। বামনপুরাণে বলা হয়েছে, সূর্য্যদেবের কোপে কুলনাশ এবং দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়[৩২]

"কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিবৃদ্ধয়ে।
ভানুর্বৈ যততে তস্য নরস্য ক্ষণদাচর॥"

মৎস্য, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে, সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণকালে শিল্পীকে মূর্ত্তির পদদ্বয় গঠন করতে নিষেধ করা হয়েছে (সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় জানু পর্য্যন্ত পাদুকাদ্বারা আচ্ছাদিত করবার যে রীতি পারসীক মগপুরোহিতগণের প্রভাবে উত্তরভারতে প্রচলিত হয়েছিল, উক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তারই ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়)। এই নিষেধবাক্য লঙ্ঘন করলে মহাপাপ হবে, সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হবেন এবং ফলে শিল্পীর কুষ্ঠব্যাধি জন্মাবে বলে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে[৩৩]

"যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি নিন্দিতাম্।
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখসংযুতঃ॥"

কুষ্ঠরোগের আরোগ্যকারিরূপে সূর্য্যের উল্লেখ এবং স্তুতিও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রচুর দৃষ্ট হয়। ভবিষ্য ও বরাহ পুরাণদ্বয়ে কথিত শাম্বোপাখ্যান এই প্রসঙ্গে পুনরায় এবং সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। সূর্য্যের প্রসাদেই ঘৃণিত কুষ্ঠব্যাধির কবল থেকে শাম্ব মুক্তিলাভ করেন, উভয় গ্রন্থেই স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে। হরিবংশে ও অন্য কোনও কোনও পুরাণে সূর্য্য ও তাঁর পত্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার পুত্র যম সম্পর্কে যে কাহিনীটি পাওয়া যায়, তার মধ্যেও সূর্য্যের কুষ্ঠরোগ আরাম করবার ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলে মনে হয়। এই কাহিনী অনুসারে, একদিন যম তাঁর বিমাতা ছায়ার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। তখন ছায়া তাঁর সপত্নীপুত্রকে এই মর্ম্মে অভিশাপ দেন যে, তাঁর (যমের) পদদ্বয় পুঁষ-শোণিতযুক্ত এবং ক্রিমিকীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত হবে। যম ভীত হয়ে পিতা সূর্য্যের নিকটে গেলেন। সূর্য্য যদিও পুত্রের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাঁকে শাপমুক্ত করতে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, তথাপি তিনি তাঁকে রোগপ্রশমনের উপায় নির্দ্দেশ করেছিলেন। তাঁর নির্দ্দিষ্ট উপায়েই যমের চরণ রোগমুক্ত হয়েছিল। বিভিন্ন পুরাণে এই ঘটনার যে বর্ণনা আছে, তাতে সামান্য খুঁটিনাটির পার্থক্য থাকলেও, মূল ঘটনার বিবরণে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। তবে মৎস্য, পদ্ম প্রভৃতি দুই একটি পুরাণে আমরা সূর্য্য-নির্দ্দিষ্ট রোগ-প্রতীকার পন্থার বিস্তারিত চিত্র পাই। উক্ত গ্রন্থগুলি অনুসারে সূর্য্য তাঁর শাপগ্রস্ত

৩২। বামনপুরাণ ১৫, ১২০ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৭১)।

৩৩। মৎস্যপুরাণ ১১, ৩২ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ৩৯); পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৮, ৫২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬২)।

পুত্রকে একটি কৃকবাকু পক্ষী দান করেন এবং বলেন যে, উক্ত পক্ষী রোগাক্রান্ত চরণের ক্রিমিসকল ভক্ষণ করবে এবং পুঁষ-রক্তও অপসারিত করবে[৩৪]

"কৃকবাকুর্ময়া দত্তো যঃ ক্রিমীন্ ভক্ষয়িষ্যতি।
ক্লেদঞ্চ রুধিরঞ্চৈব বৎসায়মপনেষ্যতি ॥"

লিঙ্গপুরাণে উক্ত কাহিনী প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শিবানুগ্রহে যমের শাপমুক্তি ঘটে—সূর্য্যানুগ্রহে নয়।[৩৫] কিন্তু লিঙ্গপুরাণ সাম্প্রদায়িক শৈবগ্রন্থ, শিবের মহিমা প্রচার এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এর এ জাতীয় সাক্ষ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বলা বাহুল্য, অন্যান্য পুরাণের সমবেত সাক্ষ্যের নিকট লিঙ্গপুরাণের একক সাম্প্রদায়িক মত নিতান্ত মূল্যহীন। শৈবধর্ম্মের জয়গান করবার জন্যই এক্ষেত্রে সূর্য্যের নাম কেটে শিবের নাম বসানো হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। যদিও পুরাণে বর্ণিত যমের রোগমুক্তির উপাখ্যানে কুত্রাপি রোগের নামোল্লেখ করা হয়নি, তথাপি রোগের কাহিনী ও পুঁষ, রক্ত ক্রিমি ইত্যাদির বর্ণনা থেকে বুঝতে দেরী হয় না যে, খুব সম্ভবতঃ উক্ত ব্যাধি কুষ্ঠ ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মত অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থ, রচনাকাল ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টীয় শতক) মালী সুমালীর উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। সূর্য্যের কোপে মালী এবং সুমালী নামক দৈত্যদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং তাদের সর্ব্বাঙ্গ গলিত ও দুর্গন্ধক্ষতযুক্ত হয়। অবশেষে ব্রহ্মার উপদেশে তারা স্তবের দ্বারা সূর্য্যকে তুষ্ট করে সূর্য্যের প্রসাদে ব্যাধিমুক্ত হয়। ব্যাধির বর্ণনা থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এ ক্ষেত্রেও কুষ্ঠব্যাধির কথাই বলা হয়েছে। উক্ত পুরাণে এই উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যে সূর্য্যস্তবের অবতারণা করা হয়েছে, তার মধ্যে সূর্য্যকে স্পষ্ট ভাষায় কুষ্ঠরোগহর বলে বর্ণনা করা হয়েছে[৩৬]

"সিদ্ধিস্বরূপং সিদ্ধেশং সিদ্ধানাং পরমং গুরুম্।
স্তবরাজমিতি প্রোক্তং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্ ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্বব্যাধেঃ প্রমুচ্যতে ॥
আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগঃ শোকো ভয়ং কলিঃ।
তস্য নশ্যতি বিশ্বেশ শ্রীসূর্য্যকৃপয়া ধ্রুবম্ ॥
মহাকুষ্ঠী চ গলিতো চক্ষুর্হীনো মহাব্রণী।
যক্ষ্মাগ্রস্তো মহাশূলী নানাব্যাধিযুতোঽপি বা।
মাসং কৃত্বা হবিষ্যান্নং শ্রুত্বা চ মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥..."

---

৩৪। মৎস্যপুরাণ ১১, ১২-১৭ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ৩৭-৩৮), পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড: ৮, ৫২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩১); বায়ুপুরাণ ৮৪, ৩১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫১০); ব্রহ্মপুরাণ ৬, ২৯-৩০ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩৪); হরিবংশ ১, ৯, ৩১-৩২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৭), ইত্যাদি।

৩৫। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ১, ৬৫, ১-২০।

৩৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—গণেশখণ্ড, ১৮, ১৯-২৩; গণেশখণ্ড, ১৯, ৪৩-৪৫ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৩৯, ২৪১)।

পদ্মপুরাণের অন্তর্গত সৃষ্টিখণ্ডের উনাশীতিতম অধ্যায়ে আমরা মধ্যদেশের সম্রাট্ ভদ্রেশ্বরের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হবার কাহিনী পাই। তাঁর বাম হাতে শ্বেতকুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছিল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁকে বলেন যে, সূর্য্যের অনুগ্রহ ভিন্ন ঐ ব্যাধি প্রশমনের দ্বিতীয় উপায় নেই। তাঁদের নির্দ্দেশ অনুসারে সম্রাট্ ভদ্রেশ্বর এক বৎসর কাল সূর্য্যের আরাধনা করেন এবং সূর্য্যের প্রসাদে শ্বেতকুষ্ঠ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পান।[৩৭] উক্ত সমগ্র অধ্যায়টি আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সপক্ষে একটি চমৎকার প্রমাণ। স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বর খণ্ডে জয়াদিত্য নামক সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভক্ত কমঠের মুখে যে সূর্য্যস্তুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানেও অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সূর্য্যের কুষ্ঠরোগহরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে[৩৮]

"ব্যাধিগ্রস্তং কুষ্ঠরোগাভিভূতং
ভগ্নঘ্রাণং শীর্ণদেহং বিসংজ্ঞম্।
মাতা পিতা বান্ধবাঃ সংত্যজন্তি
সর্ব্বৈস্ত্যক্তং পাসি কোঽন্তি ত্বদন্যঃ॥"

পৌরাণিক সাহিত্যের বাইরে কুষ্ঠ-আরামকারিরূপে সূর্য্যকে অর্চ্চনা করবার বিধির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় কবি ময়ূর-রচিত "সূর্য্যশতক" কাব্যে। ময়ূর পুষ্যভূতি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনি উক্ত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য-রচনার পশ্চাতে যে কিংবদন্তী আছে, তা বর্ত্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। শোনা যায় যে, কবি ময়ূর কোনও সময়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন এবং রোগমুক্তির নিমিত্ত সূর্য্যের বন্দনা করে "সূর্য্যশতক" কাব্যখানি রচনা করেন। ফলে তিনি রোগমুক্ত হন। আলঙ্কারিক মম্মট তাঁর "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থে এই কিংবদন্তীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। কাব্যচর্চ্চার প্রয়োজনগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি যশ অর্থ ইত্যাদির সহিত অনর্থনিবারণের ( অর্থাৎ রোগাদি বিপদ্ হতে মুক্তি ) প্রসঙ্গও উত্থাপিত করেছেন এবং সেই সূত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি ময়ূর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীর কথা বলেছেন ( আদিত্যাদের্ময়ূরাদীনামিবানর্থ-নিবারণম্ )।[৩৯] এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, ময়ূরপ্রণীত "সূর্য্যশতক" কাব্যে অন্ততঃ একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যেখানে সম্ভবতঃ সূর্য্যকে কুষ্ঠরোগহররূপে বর্ণনা করা হয়েছে[৪০]

"শীর্ণঘ্রাণাঙ্ঘ্রিপাণীন্ ব্রণিভিরপঘনৈর্ঘর্ঘরাব্যক্তঘোষান্
দীর্ঘাঘ্রাতানঘৌঘৈঃ পুনরপি ঘটয়ত্যেক উল্লাঘয়ন্ যঃ।

---

৩৭। পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ড, অধ্যায় ৭৯ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৮০৩-০৫ )।

৩৮। স্কন্দপুরাণ—মাহেশ্বরখণ্ড, ২, ৫১, ৭১ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫১৩ )।

৩৯। কাব্যপ্রকাশ ( পুণা সং, প্রথম উল্লাস ) পৃঃ ৮; এই অংশের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৪০। সূর্য্যশতক-শ্লোক ৬ (The Sanskrit Poems of Mayura, edited by G. P. Quackenbos, New York 1917, p 115)

যর্ম্মাংশোস্তস্ত বোহন্তর্দ্বিগুণঘনঘৃণানিঘ্ননির্বিঘ্নবৃত্তে-
র্দত্তার্ঘাঃ সিদ্ধসংঘৈর্বিদধতু ঘৃণয়ঃ শীঘ্রমংহোবিঘাতম্ ॥”

“অনেক পাপকর্মহেতু যাদের হস্তপদনাসিকাদি কুঞ্চিত, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতযুক্ত, দুর্গন্ধ এবং ( মুখবিবর হতে ) অস্ফুট ঘর্ঘর শব্দ নির্গত ( হয় ), সূর্য্য তাদের নূতন ( তনু প্রদান ) করেন ; স্বীয় অন্তরের অসীম কারুণ্য ভিন্ন যাঁর আচরণ অন্য সকল বিঘ্নকে উপেক্ষা করে, সিদ্ধগণ যাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করেন, সেই তপ্তরশ্মিযুক্ত ( সূর্য্যের ) কিরণ, তোমাদের পাপসকল শীঘ্র নাশ করুক।” এই শ্লোকে সূর্য্যকে যে রোগের নাশকরূপে অভিহিত করা হয়েছে, তার প্রধান লক্ষণগুলি হল, হস্তপদনাসিকাদির কুঞ্চন, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত ও দুর্গন্ধ এবং ( নাসিকাদির কুঞ্চন হেতু ) মুখ-নিঃসৃত অস্ফুট ও অস্পষ্ট শব্দ। চিকিৎসাশাস্ত্রে কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বলক্ষণগুলির অনুরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে[৪১]—“তেষামিমানি পূর্ব্বরূপাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা অস্বেদনমতিস্বেদনং পারুষ্যমতিশ্লক্ষ্ণতা বৈবর্ণ্যং কণ্ডূর্ণিস্তোদঃ সুপ্ততা পরিদাহঃ পরিহর্ষো লোমহর্ষঃ খরত্বমূষ্মায়ণং গৌরবং শ্বয়থুর্বিসর্পাগমনভীক্ষ্ণং চ কায়ে কায়চ্ছিদ্রেষু পদেহঃ পক্বদগ্ধদষ্ট-ভগ্নক্ষতোপস্খলতেষ্বতিমাত্রং বেদনা স্বল্পানামপি চ ব্রণানাং দুষ্টিরসংরোহণং চেতি।” ‘সূর্য্যশতক’ কাব্যখানি রচিত হওয়ার মূলে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উদ্ধৃত শ্লোকে বর্ণিত রোগলক্ষণগুলির আলোচনা করলে স্বভাবতঃ মনে হয়, এখানে কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের কথাই বলা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত কুষ্ঠরোগের লক্ষণসমূহও মোটামুটি উক্ত বর্ণনার সঙ্গে মেলে, যদিও চরকসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণ স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী বিস্তারিত। ভবিষ্য ও বরাহপুরাণদ্বয়ে বর্ণিত কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠাক্রান্ত ও কুষ্ঠরোগমুক্ত হওয়ার কাহিনীর সঙ্গে, কবি ময়ূর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীর সাধারণভাবে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক স্থানে উপাখ্যান দুটির মধ্যে মিল আরও গভীর। শাম্বের অপরূপ রূপলাবণ্য তাঁর বিমাতৃগণের চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, এই সন্দেহে কৃষ্ণ তাঁর পুত্রকে অভিশাপ দেন এবং ফলে তাঁর কুষ্ঠরোগ জন্মায়। কবি ময়ূর সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যায়, তিনি দূর থেকে স্বীয় কন্যাকে ( মতান্তরে ভগ্নীকে ) দেখে চিনতে না পেরে নায়িকারূপে তার সৌন্দর্য্যের আদিরসাত্মক বর্ণনা করেন, এবং কন্যার শাপে তাঁর দেহ কুষ্ঠাক্রান্ত হয়। শাম্ব ও ময়ূর উভয়ের ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ স্থানে আদিরসের সঞ্চার কুষ্ঠরোগের কারণ। আবার সূর্য্যের আরাধনা ও তাঁর অনুগ্রহ শাম্ব ও ময়ূর উভয়েরই রোগমুক্তির হেতু। সুতরাং মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের ভারতে আগমন কাহিনীর মূলে যে ঐতিহ্য পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, কবি ময়ূর কর্তৃক সূর্য্যশতক কাব্য রচনার মূলেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সেই একই ঐতিহ্য দেখা যাচ্ছে, এ কথা স্বভাবতঃই মনে হয়। সূর্য্যকে রোগনাশক ও বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগনাশকরূপে দেখবার ও অর্চ্চনা করবার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী উক্ত ঐতিহ্যের

---

৪১। চরকসংহিতা ২, ৫, ৭, ( যাদবজি ত্রিকমজি আচার্য্যকৃত সং, বোম্বাই, ১৯৪১, পৃঃ ২১৮ )।

মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে প্রদত্ত সূর্য্যের অষ্টোত্তরশতনামের তালিকায়, তাঁর অন্যতম নাম পাওয়া যায় "ধন্বন্তরি"; স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত আর একটি নামের তালিকায় সূর্য্যের কয়েকটি নাম "ভিষগ্‌বর" "সঞ্জীবন" এবং "অরোগ"; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণস্থ অনুরূপ একটি তালিকায় সূর্য্যের অন্যতম নাম "রোগহা"।[৪২] নামগুলির মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চ্চনার ঐতিহ্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে রক্ষিত ও প্রচারিত হয়ে এসেছে। কালক্রমে এই মনোভাবের প্রসার এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, দেবগণের মধ্যে সূর্য্যকে বিশেষভাবে আরোগ্যের দেবতা হিসাবে বর্ণনার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল। মৎস্যপুরাণের একটি সুপরিচিত শ্লোকে বলা হয়েছে, সূর্য্যের নিকট কাম্য আরোগ্য; অগ্নির নিকট কাম্য ধন; শিবের নিকট কাম্য জ্ঞান এবং বিষ্ণুর নিকট কাম্য মুক্তি[৪৩]—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ।
ঈশ্বরাৎ জ্ঞানমিচ্ছেৎ মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ।"

বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা করবার এই বিশিষ্ট মনোভাবগুলি যে ক্রমশঃ ভারতীয় সমাজে কত গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্মৃতিকার রঘুনন্দন (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) তাঁর রচনায় মৎস্যপুরাণ থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে সমর্থন করেছেন।[৪৪] স্মৃতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, হেমাদ্রি তাঁর সুবিখ্যাত "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" গ্রন্থের ব্রতখণ্ডে বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ থেকে যে সকল সৌর ব্রতের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলির অধিকাংশের পালনে যে রোগমুক্তি ও আয়ুঃবৃদ্ধি ঘটবে, এ কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ আমরা নৃসিংহপুরাণোক্ত "সৌরনক্তব্রত," ভবিষ্যপুরাণোক্ত "আদিত্যবারে নন্দাবিধি" ও "দিবাকর ব্রত," স্কন্দপুরাণোক্ত "আশাদিত্যব্রত," মৎস্যপুরাণোক্ত "সূর্য্যনক্তব্রত," ভবিষ্যোত্তর পুরাণোক্ত "রোগহর-বিধি," সৌরধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত "সূর্য্যব্রত" প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। হেমাদ্রির সংকলনে এগুলির বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[৪৫] অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এই প্রসঙ্গে স্মৃতিকার গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্যের "বর্ষক্রিয়াকৌমুদী" (রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের

---

৪২। মহাভারত—৩, ৩, ২৫; স্কন্দপুরাণ—১, ২, ৪৩, ১৯-২৭ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৬৫-৬৬); বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ৩, ১১, (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩২০)।

৪৩। মৎস্যপুরাণ ৬৭, ৪১ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ২৬৭); এই প্রচলিত শ্লোকটির প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্তা সুধা সেনগুপ্ত। পরে মৎস্যপুরাণে আমি সেটি খুঁজে পেয়েছি।

৪৪। রঘুনন্দন—একাদশীতত্ত্বম্ (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি—শ্রীরামপুর সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২); রঘুনন্দনপ্রদত্ত এবং লোকপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঠ প্রারম্ভে "জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ..."

৪৫। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সং) দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫২১, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩২, ৫৩৬ ৫৪০, ৫৫৩, ইত্যাদি।

প্রথমার্দ্ধ ) এবং রঘুনন্দনের "তিথিতত্ত্বম্" গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গোবিন্দানন্দ তাঁর গ্রন্থে মিত্রসপ্তমী, বিজয়াসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী প্রভৃতি কয়েকটি সৌরব্রতের উল্লেখ করেছেন। সৌরধর্ম্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিকে কেন্দ্র করেই এই ব্রতগুলির সৃষ্টি। আরোগ্যসপ্তমীর বর্ণনায় দেখা যায়, এই ব্রতপালনের অন্যতম ফল রোগমুক্তি।[৪৬] রঘুনন্দন তাঁর "তিথিতত্ত্ব" গ্রন্থে ( রচনাকাল ষোড়শ খ্রীষ্টীয় শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ) সপ্তমী তিথির আলোচনা প্রসঙ্গে বিজয়া-সপ্তমী, আরোগ্যব্রত, বিধানসপ্তমী প্রভৃতি সৌরব্রতের উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, সৌরধর্ম্মের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মাঘ মাসের সপ্তমী তিথি উপলক্ষ্যেই এগুলিও পালনীয়। এর মধ্যে আরোগ্যব্রত পালনে যে রোগমুক্তি ঘটে, রঘুনন্দন সে সম্পর্কে পৌরাণিক নজির ত উদ্ধৃত করেছেনই, স্বয়ংও স্পষ্ট ভাষায় সেই মত প্রকাশ করেছেন ( রবিশ্চ বিষ্ণুরূপতয়া পূজাকালে ধ্যেয়ঃ অভিলাপে তু তত্তিথ্যাবিত্যুক্ত্যা আরভ্যেতি ঐহিকারোগ্যধনধান্য-পারলৌকিকশুভস্থানলাভকামঃ )।[৪৭] যে নিবন্ধকারগণের মতবাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আমাদের মূল বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁদের সাক্ষ্য যে যথেষ্ট মূল্যবান্, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

সূর্য্যকে রোগহররূপে কল্পনা ও আরাধনা করবার অভ্যাসের ব্যাপক প্রচলনের কিছু আভাস প্রাচীন ভারতের কোনও কোনও খোদিত লিপিতেও পাওয়া যায়। ৪৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, "রোগ এবং মানসিক উত্তেজনার দ্বারা পীড়িত লোকে তাঁকে ( সূর্য্যকে ) আশ্রয় করে চেতনা লাভ করে থাকে" ( যং লোকো বহুরোগবেগবিবশঃ সংশ্রিত্য চেতোলভঃ… )।[৪৮] বাংলা দেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাইরহাট্টা নামক স্থানে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির পাদপীঠে খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকের অক্ষরে খোদিত লিপিতে সূর্য্যকে বলা হয়েছে, "সমস্ত-রোগানাং হর্ত্তা" ( সমস্ত রোগের নাশক )।[৪৯] পূর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোবিন্দপুর শিলালিপিতে শাম্বকর্ত্তৃক মগব্রাহ্মণগণকে ভারতবর্ষে আনয়ন ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। শাম্বের রোগমুক্তির কাহিনীর উল্লেখ অবশ্য ঐ শিলালিপিতে নেই, কিন্তু এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না, উক্ত শিলালিপির লেখক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কবি গঙ্গাধর শাম্বোপাখ্যানের সেই অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আলোচনার ধারা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে অন্ততঃ ষোড়শ শতক ( গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দনের কাল ) পর্য্যন্ত উত্তরভারতে মগ বা

---

৪৬। বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ( বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সং ) পৃঃ ৫০১-০২।

৪৭। তিথিতত্ত্বম্ ( অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি,—শ্রীরামপুর সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২ )।

৪৮। Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, pp. 70 71

৪৯। History of Bengal (Dacca University), Vol ( p, 456 )

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রভাবে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। এ কথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে, উক্ত বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সৌরধর্ম্মের বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী পর্ব্বের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করেছিল। বৈদিক আর্য্যগণ সূর্য্যকে রোগহররূপে কল্পনা করেছিলেন। বিদেশী মগ সৌরপুরোহিতবৃন্দও সূর্য্যকে আরোগ্যকারী এবং বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগনাশকরূপে পূজা করবার ঐতিহ্য সঙ্গে করে ভারতে নিয়ে আসেন। বৈদিক যুগ থেকে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনায় অভ্যস্ত ভারতীয়গণ উক্ত বিদেশী ঐতিহ্যের মধ্যে তাদের নিজস্ব সৌরধর্ম্মের অন্যতম পরিচিত রূপই দেখতে পেয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণে তারা সূর্য্যপূজার এই নবাগত বিদেশী পর্ব্বের প্রতি কোনও প্রকার বিরূপতা প্রদর্শন করেনি। অপর পক্ষে ইরাণীয় সৌর-পুরোহিতগণের পক্ষেও তাঁদের নূতন কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কারকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। বৈদিক সৌরধর্ম্মে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনার প্রচলন থাকায়—বৈদিক সূর্য্যপূজার এই দিকটির সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সৌরধর্ম্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন, এবং নিজেদের মতবাদকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে সম্ভবতঃ বৈদিক সৌরধর্ম্মেরই ধারা হিসাবে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতের সর্ব্বত্র সূর্য্যোপাসনার এই বৈশিষ্ট্যটির ( অর্থাৎ সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনার ) উপর জোর দেবার ধুম পড়ে যায়। ক্রমশঃ সূর্য্য হয়ে দাঁড়ান প্রধানতঃ আরোগ্যের দেবতা, পুরাণকার ও নিবন্ধকারগণও বিশেষ করে তাঁর এই স্বরূপটির উপরই জোর দেন। বৈদিক যুগে যা ছিল সূর্য্যের বহু স্বরূপের অন্যতম, পরবর্ত্তী কালে তাই হয়ে দাঁড়াল সূর্য্যের প্রধানতম স্বরূপ। ভারতীয় সৌরধর্ম্মের প্রাচীন ও নবীন, দুই পর্ব্বেই সমানভাবে উপস্থিত এই লক্ষণীয় বিশেষত্বটির জন্যই ভারতীয় জনমানস উক্ত দুটি ধারার মধ্যে কোনও পার্থক্য অনুভব করেনি, উপাসকমণ্ডলীর দৃষ্টিতে তারা সহজে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণও যে তাঁদের দ্বারা এদেশে আনীত সৌরধর্ম্মের নূতন অধ্যায়কে বৈদিক সৌরধর্ম্ম হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি, নিজেদের যে তাঁরা বৈদিক সৌরধর্ম্মের উত্তরসাধক প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তার প্রমাণ আবিষ্কার করা সম্ভবতঃ কঠিন নয়। তাঁদের মধ্যে বেদচর্চ্চার প্রচলনের দৃষ্টান্ত সাহিত্যে ও শিলালেখে পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে মগগণকে "বেদবাদী" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং শাকদ্বীপে যে বৈদিক বিধি অনুযায়ী সূর্য্যের পূজা হয়, সে বিষয়েও সূর্য্যের মুখ দিয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করানো হয়েছে[৫০]—

"তেভ্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ মগহস্তা ময়োদিতাঃ
বেদোক্তৈঃ বিধিভিঃ স্তোত্রৈঃ পঠন্তি হৈর্ম্মা স্তুতৈঃ।

৫০। ভবিষ্যপুরাণ ১, ১৩৯, ৭৬-৭৭, ৯০ ( বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১২৫-২৬ )।

"তে চ ধ্যায়ন্তি মামেব যজন্তে মাং চ নিত্যশঃ।
মন্মানসা মদ্‌যজনা মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ।"

গোবিন্দপুর শিলালিপিতে উল্লিখিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশে যে রীতিমত বৈদিক সাহিত্যের চর্চ্চা ছিল, তার প্রমাণ ঐ শিলালিপিতেই আছে। বংশের আদিপুরুষ ভরদ্বাজকে সেখানে বলা হয়েছে "সমস্তনিগমজ্ঞানাম্বুবিশ্রাপদ।" ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বংশের পরবর্ত্তী কয়েক জন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে—

"সংকল্পপ্রবণাঃ শ্রুতিপ্রণয়িনঃ শিক্ষাভিরুদ্ভাসিতাঃ।
সজ্জ্যোতির্গতয়োঃ নিরুক্তবিশদাশ্ছন্দোবিদো সাধবঃ।
খ্যাতা ব্যাকরণক্রমেণ বিদুষামত্যুচ্চধীশীলনা।
বেদাঙ্গপ্রতিমাঃ ষড়েব ভুবনে তে বিভ্রতি ভ্রাতরঃ॥"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিজেদের ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী প্রমাণ করবার জন্য বহিরাগত মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সম্ভবতঃ চেষ্টার ক্রটি হয়নি। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞগণের মতে সেন-যুগে বাংলা দেশে যে সূর্য্যের পূজা প্রচলিত ছিল, সে সূর্য্য বৈদিক দেবতা নন, মগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত ইরাণীয় সূর্য্যদেবতা; এবং খোদিত লিপিতে কোনও কোনও সেনবংশীয় রাজার "পরমসৌর" উপাধি, তৎকালীন যে সৌরধর্ম্ম ও সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সূচিত করে, সেই ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়ও বিদেশী ইরাণীয় প্রভাবপুষ্ট।[৫১] কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশের উক্ত বিদেশী প্রভাবান্বিত সূর্য্যপূজা যে বাহ্যতঃ বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে রফা করেছিল, তা সম্ভবতঃ বোঝা যায় "পরমসৌর" বলে অভিহিত সেনরাজ কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে প্রাপ্ত সূর্য্যের বন্দনাত্মক শ্লোকটি পাঠ করলে। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন থেকে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হল[৫২]—

"বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকারকারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুক্তিহেতুম্।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্মমুত্তান্তমদ্ভুতখগং নিগমদ্রুমস্থ॥"

এখানে সূর্য্যকে স্পষ্টভাষায় "নিগমদ্রুমস্থ অদ্ভুতখগং" অর্থাৎ 'বেদরূপী তরুতে অবস্থিত অদ্ভুত পক্ষী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং মনে হয়, প্রাচীন বাংলার সৌরধর্ম্ম মূলতঃ বিদেশীপ্রভাবপুষ্ট হয়ে থাকলেও বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাকে আপোষ করতে হয়েছিল।

এইরূপে বৈদিক ও ইরাণীয় সৌরধর্ম্মের সমন্বয়ের ফলে আরোগ্য-দেবতা হিসাবে সূর্য্যের আসন ভারতীয় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে এ কথাও মানতে হয় যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত সূর্য্যের রোগ-হর স্বরূপের অর্চ্চনা ভারতীয় সৌরধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট ও

---

৫১। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় সং), পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৫২। N. G. Majumdar: Inscriptions of Bengal, Vol III, pp. 121, 143

প্রধান অঙ্গ ছিল। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সে সকলের মধ্যে সূর্য্যপূজার স্থান উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চ্চনার পূর্ব্বপ্রাধান্য বর্ত্তমানে আর নেই। হিন্দুর নিত্যক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠানে সূর্য্যপূজার মূল বৈদিক ঐতিহ্যই যেন বর্ত্তমানে অধিকতর সক্রিয়। এবং সে ক্ষেত্রেও বৈদিক ঐতিহ্যের ধারা থেকে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের উপাসনা লুপ্তপ্রায়। আধুনিক কালে প্রচলিত নানা লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে ( যেমন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পালিত 'সূর্য্যব্রত' 'ভপাব্রত' 'ইতুপূজা' 'মাঘমণ্ডলব্রত' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কোনও কোনওটির ভিতর ) হয়ত পুরাণোক্ত প্রাচীন সৌরব্রতগুলির স্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হয়েছে ; কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রেও পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্যকে প্রধানতঃ রোগহর দেবতারূপে কল্পনা ও অর্চ্চনা করবার বিধি দৃষ্ট হয় না। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী প্রভাব যুক্ত হওয়ার ফলে, সূর্য্যের যে স্বরূপের পূজা ভারতে এককালে বহুলপ্রচলিত হয়েছিল, তার প্রাধান্য ও গুরুত্ব, মধ্যযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সৌরধর্ম্মের এই পরিণতির ইতিহাস অবশ্য বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়।

# বাংলা বিরামাদি চিহ্ন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

পূর্বকালে বাংলা গদ্য রচনায় মাত্র এক-দাঁড়ির ব্যবহার ছিল। পদ্যে, পয়ারে প্রথম চরণে এক-দাঁড়ি ও দ্বিতীয় চরণে দু-দাঁড়ি এবং ত্রিপদী-ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরে চারি (৪) অঙ্কের তুল্য একটা চিহ্ন দেওয়া হইত। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী কমা ও আরও দুই-একটি চিহ্ন বাংলা রচনায় প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার ছিল না; সর্ব-সাধারণে তাঁহার অনুসরণ করিতেন না। ৭০।৮০ বৎসর পূর্বের লিখিত পত্র ও দলিল-দস্তাবেজে দাঁড়ি ভিন্ন কোন চিহ্নই থাকিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইংরেজী বিরামাদি চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ্য-পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়াতে বাংলা রচনায় সে সব চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি সে সকল চিহ্নের বাংলা নাম রচিত ও প্রচারিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্ন-চিহ্ন ইত্যাদি চিহ্নের নাম নহে, চিহ্ন-প্রয়োগের নাম। কমা-চিহ্ন দ্বারা পাদচ্ছেদ, কি অর্ধচ্ছেদ, কি আর কিছু বুঝিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত হয় না। গণিত পুস্তকেও বহুবিধ চিহ্ন প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকলেরও বাংলা নাম নাই। যুক্ত-চিহ্ন, বিযুক্ত-চিহ্ন ইত্যাদি বলিলে সে সে চিহ্নের আকার বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমে চিহ্ন, পরে নাম, তার পর প্রয়োগ নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে "বাঙ্গালা নবলিপি" নামক প্রবন্ধে আবশ্যক যাবতীয় চিহ্নের নাম সঙ্কলন করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কিম্বা পশ্চিম-বঙ্গ-রাজ্যের অনুমোদন ব্যতীত প্রচারিত হইতেছে না; এই অভাবও দূর হইতেছে না।

এক্ষণে ইংরেজী বিরামাদি চিহ্নের আমার উদ্ভাবিত নামের সার্থকতা দেখাইতেছি।

| চিহ্ন | নাম |
|---|---|
| , | কলা। ইহার আকার এককলা চন্দ্রের ন্যায়। কলা হইতে কড়া, চারি কড়ায় এক গণ্ডা। কলা, এই নামের দ্বারা পাদচ্ছেদও বুঝাইতেছে। |
| ; | বিন্দু-কলা। কলার মাথায় বিন্দু, বিন্দুটি এক কলার বিন্দু। অতএব, দুই কলার যোগ হইয়াছে। |
| ’ | উৎকলা। অর্থাৎ, যে কলা কোন অক্ষরের পরে নীচে না বসিয়া উপরে বসে। আমি ইহার নাম 'উর্ধ্বকমা' রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এই সঙ্কর নাম ভাল হয় নাই। |
| ‘ ’ | ব্যুৎকলা। বি-উৎকলা, অর্থাৎ উৎকলা ও ব্যুৎক্রমে আর এক উৎকলা। |
| “ ” | এই ব্যুৎকলা দুইটি দুইটি হইলে "জোড়া-ব্যুৎকলা"। |

| চিহ্ন | নাম |
|---|---|
| . | বিন্দু। কোন শব্দের অক্ষর অকারান্ত পড়িতে হইলে সে অক্ষরের পরে বিন্দু-চিহ্ন দিলে পাঠকের উচ্চারণে সুবিধা হয়। যেমন,—<br>কট্‌মট্‌ করে' তাকাচ্ছে ; কিন্তু কট.মট. চোখ। শিব দেবতা ; কিন্তু শিব. মঙ্গলময়। |
| । | দাঁড়ি। অর্থাৎ, দণ্ডাকৃতি। |
| ॥ | দু-দাঁড়ি। দুইটি দণ্ড। |
| ? | খড়্গ। খড়্গের আকার-সাদৃশ্যে নাম। |
| ! | তিলক। ললাটে অঙ্কিত তিলকের তুল্য। |
| ¡ | বিতিলক। অর্থাৎ বিপর্যস্ত তিলক। সম্বোধন চিহ্ন। পূর্বে সম্বোধন চিহ্নের পর তিলক দেওয়া হইত। এক্ষণে প্রায় দেওয়া হয় না, কলা দেওয়া হয়। কারণ, বাক্যে সম্বোধনের পরে 'তুমি' অথবা 'আপনি,' 'তোমার' বা 'আপনার' এইরূপ শব্দ লিখিত হয়। তদ্দ্বারাই সম্বোধন বুঝিতে পারা যায়। যথা,—মহারাজ, আপনার জয় হউক। তথাপি কোন কোন স্থলে সম্বোধন চিহ্ন থাকিলে অর্থবোধ সুগম হয়। যথা,—ভারতমাতা ¡ আমরা স্বাধীন হইয়াও উপবাসী রহিয়াছি। |
| — | রেখ। ( ইং ড্যাশ )। |
| ( - ) | লিক। ( বাং লিকি, সং লিক্ষা, ইং হাইফেন )। |
| ʌ | কাকপদ। সংস্কৃত নাম। |
| * | তারা। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা। |
| † | ত্রিশূল। |
| P | পতাকা। |

বেষ্টনীর চিহ্ন,—

| | |
|---|---|
| ( ) | চাপ। |
| { } | দীর্ঘ চাপ। |
| [ ] | বাহু। |

গণিত কর্মের চিহ্ন,—

| | |
|---|---|
| + | বজ্র। ( সংস্কৃত নাম )। |
| − | রেখক। ( বিয়োগ চিহ্ন )। |
| × | ঢেরা। ( ইহা হইতে বাং ঢেরা, যেমন ঢেরাসই )। |
| ÷ | বিন্দু-রেখক। |
| / | তির্যক। ভাজন চিহ্ন। |
| = | দ্বিরেখক। |

| চিহ্ন | নাম |
| --- | --- |
| ৲ | ইলেখ। ( অর্থাৎ ই-রেখ )। কড়া, গণ্ডা ইত্যাদি বুঝাইবার চিহ্ন। অঙ্কের বামে বসে। |
| ৲ | বিলেখ। ( অর্থাৎ বিশিরস্ক ইলেখ )। কাহন বুঝাইবার চিহ্ন। অঙ্কের দক্ষিণে বসে। |

উৎকলার ' প্রয়োগ।

কোন কোন শব্দের মৌখিক উচ্চারণে 'ই' এবং 'য়-ফলা' প্রস্তু হয়। লিখনে এই লুপ্ত বর্ণ না জানাইলে প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় না। যেমন কলিকাতা, মৌখিক উচ্চারণে 'কলকাতা' নয়, কইলকাতা ( ঈষৎ-ই )। এই ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের নিমিত্ত উৎকলা দেওয়া আবশ্যক। এখানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে যথাস্থানে উৎকলা প্রয়োগের প্রয়োজন দেখাইতেছি।

( ১ ) বিশেষ্য পদে,—

চা'ল ( চলন, যেমন নবাবী চা'ল। 'চাল' ঘরের )।

ডা'ল ( 'ডাল' গাছের )।

নৌকার পা'ল ( 'পাল' গোরুর )।

নৌকার হা'ল ( 'হাল' অবস্থা। 'হাল' বর্তমান, যেমন হাল সন )।

চাল-চলন, মার-ধর ইত্যাদি স্থলে পরবর্তী শব্দ হেতু অর্থবোধে কষ্ট হয় না ; এখানে উৎকলা না দিলেও চলে।

( ২ ) বিশেষণ পদে,—

( ৴৹ ) শব্দের উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হইলে সংক্ষেপে য়-ফলা উচ্চারিত হয়। যথা,—চাকর + ইয়া = চাকর্যে ( বাবু )। 'চাকরে বাবু' নয়। এইরূপ, আহ্লাদ্যে ছেলে, পাহাড়্যে সাপ, বেগুন্যে রং, আগুন্যে বোমা। আরও সংক্ষেপ করিতে হইলে, শব্দের শেষে য়-ফলা স্থানে উৎকলা দিলে য়-ফলা লুপ্ত বুঝিতে পারা যায়। যথা,—চাকরে' বাবু, আহ্লাদে' ছেলে, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য,—শীতকাতুরে, আমুদে, হাটুরে, সাপুড়ে ইত্যাদি শব্দে পূর্ববর্তী বর্ণে উকার-যোগ হেতু শব্দের অন্তে উৎকলা দিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি অতিপ্রচলিত শব্দে 'ইয়া' প্রত্যয় হইলেও উৎকলা দিতে হয় না। যেমন,—পুবে ( পুবিয়া ) বাতাস, বিশে ( বিশিয়া ) পৌষ, ইত্যাদি।

( ৵৹ ) 'উয়া' প্রত্যয়ান্ত শব্দে মৌখিক ভাষায় 'উয়া' স্থানে 'ও' হয়। যেমন,— জলুয়া = জলো ( দুধ )। কিন্তু এই বানানে 'জ' অক্ষরের উচ্চারণ অকারান্তই থাকে ; আমরা যেমন উচ্চারণ করি, তেমন হয় না। 'জ'এর পর ঈষৎ-ই উচ্চারিত হয়। অতএব, 'জ'লো দুধ' লেখাই উচিত। এইরূপ ম'দো গন্ধ, প'ড়ো বাড়ী, পাঠশালার প'ড়ো, ইত্যাদি।

( ৩ ) ক্রিয়াপদে,—

( ৴৹ ) হইল, হইত, হইলে, হইতে ইত্যাদি স্থলে মধ্যের 'ই' প্রস্তু হইয়া মৌখিক

ভাষায় "হ'ল, হ'ত, হ'লে, হ'তে" হয়। এখানে উৎকলা ঈষৎ-ই লোপের চিহ্ন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

( ৵৹ ) "করিও, বলিও" ইত্যাদি মৌখিক ভাষায় "ক'রো, ব'লো" লেখাই উচিত। 'করো, বলো' লিখিলে অর্থ ঠিক হয় না। এইরূপ ইত, ইল, ইব ইত্যাদি ধাতু-বিভক্তির 'ই' গ্রস্ত হয়। এ স্থলে উৎকলা দেওয়া কর্তব্য। যেমন,—করিত—ক'রত, করিল—ক'রল, করিব—ক'রব।

( ৶৹ ) সে বসে গল্প করে চলে যায়,—এইরূপ লিখিলে অর্থ দাঁড়ায়, সে উপবেশন করে, গল্প করে, চলে, পরে যায়। কিন্তু বক্তা বলিতে চাহেন, "সে বসিয়া গল্প করিয়া চলিয়া যায়।" অতএব শুদ্ধ বানান,—সে বসে' গল্প করে' চলে' যায়। এই সকল স্থলে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় লুপ্ত ; অক্ষরলোপের চিহ্নই উৎকলা।

( ।৹ ) ক্রিয়াপদের অন্তে 'ইয়ে' থাকিলে উৎকলা আবশ্যক হয় না। কারণ, 'য়'এর উচ্চারণই যথেষ্ট। যেমন,—বসে' দাঁড়িয়ে কাল কাটায়। এইরূপ, খেয়ে, দিয়ে, হয়ে ইত্যাদি।

( ।৵৹ ) দৌড়ে যায়, শুনে হাসে, খেলে পালায়, মেরে ধরে, ইত্যাদিতে উৎকলা না দিলেও অর্থবোধে কষ্ট হয় না।

প্রথমে বিচার্য, উৎকলা বর্ণলোপের চিহ্ন, না ঈষৎ-'ও' উচ্চারণের চিহ্ন? যদি 'ও' উচ্চারণের চিহ্ন ধরি, তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি পাই না। ব্যুৎপত্তি অনুসারে বর্ণলোপের চিহ্ন রাখাই কর্তব্য।

এক্ষণে যাঁহারা উৎকলা প্রয়োগে আলস্য বোধ করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, তাঁহারা বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন করিয়া ফেলিতেছেন। একবার আমি "চাল-তত্ত্ব" নামে একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। নাম হইতে বুঝিয়াছিলাম, 'গৃহের চাল নির্মাণতত্ত্ব'। পড়িয়া দেখি, চাউল বা চাইলতত্ত্ব। আর একখানি পুস্তকের নাম "চার-স্থান।" আমি বুঝিয়াছিলাম, চর-সন্নিবেশ। গ্রন্থকার বলিতে চাহেন, চারি স্থান, সংক্ষেপে চা'র-স্থান। সম্প্রতি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত একখানি পুস্তক দেখিলাম। পুস্তকখানি মৌখিক ভাষায়, না কোন্ ভাষায় লিখিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই পুস্তকের কুত্রাপি উৎকলা নাই। এইরূপ পুস্তক পড়িয়া বালক-বালিকারা লৈখিক বা মৌখিক, কোন ভাষাই শিখিতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার কর্তব্য।

# ভাষা চতুর্ব্যূহ-রূপ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেংগয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদংতি॥"—ঋগ্বেদ ১. ১৬৪. ৪৫।

"বাক্‌সমূহের পদসমুচ্চয় চারি প্রকারে পরিচিত। লোকে যে বাক্ (ভাষা) প্রচলিত আছে, তাহা চতুর্বিধ। বেদবিৎ মনীষিগণ এই চতুর্বিধ পদ জানেন। তাহাদের মধ্যে ত্রিবিধ গুহায় নিহিত বা স্থাপিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থপ্রকার পদ অজ্ঞ বা পদজ্ঞ মনুষ্যেরা স্পষ্ট উচ্চারণ করেন বা ব্যবহার করেন।"—(ভাষ্যানুবাদ)

এই চারি প্রকার পদ কি?—এ বিষয় অনেকে স্ব স্ব মতানুসারে নানাপ্রকারে বর্ণনা করেন :—

(১) কোন কোন বেদবাদী বলেন,—সকল বৈদিক বাক্‌সমূহের সংগ্রহরূপ ভূঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতিত্রয় ও এক প্রণব। ব্যাহৃতিত্রয় বেদত্রয়ের সারভূত এবং অকারাত্মক প্রণব সারসংগ্রহ —এই হেতু সপ্রণব ব্যাহৃতিসমূহে বাক্‌সমূহ পরিচিত, অর্থাৎ চতুর্ধা বিভক্ত।

(২) ব্যাকরণ-মতানুসারীর সিদ্ধান্ত,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত ভেদে বাক্‌সমূহ চতুর্বিধ; দ্রব্যপ্রধান নাম, ক্রিয়াপ্রধান আখ্যাত, আখ্যাতের পূর্বে প্রযুক্ত প্র-প্রভৃতি উপসর্গ, নানার্থে নিপাতনহেতু 'অপি' 'তু' 'চ' ইত্যাদি নিপাত; এই চতুষ্টয়ে বাক্‌সমূহ পরিচিত। এই প্রকারে অখণ্ড বাক্‌সমূহ চারি ভাগে ব্যাখ্যাত।

(৩) যাজ্ঞিকগণের মত,—মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ লৌকিক ভাষা। যাজ্ঞিকেরা বিশেষ ভাবে বলেন,—অনুষ্ঠেয়ার্থ-প্রকাশক বেদভাগ মন্ত্র, অতঃপর কল্প, মন্ত্রার্থপ্রকাশক বেদভাগ ব্রাহ্মণ, ভোগবিষয়—'গাভী' 'অশ্ব' ইত্যাদিপ্রকার ব্যাবহারিক ভাষা,—এই চতুষ্টয়ে সকল ভাষা নিয়মিত।

(৪) নিরুক্তবেদীরা স্বীকার করেন,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্যাবহারিক ভাষা :—এই চারিটিতে সর্বভাষা বিভক্ত।

(৫) ঐতিহাসিকগণের অভিমত,—সর্পগণের, পক্ষিসমূহের ও ক্ষুদ্র সরীসৃপের ভাষা এবং ব্যাবহারিক ভাষা—এই চারি ভাগে সকল ভাষা পরিচিত।

(৬) আত্মবাদিগণ বলেন,—পশুসমূহের ও হরিণগণের (?) ভাষা, বাক্যসমূহের ধ্বনি এবং আত্মভাষা—এই চতুর্বিধ ভাষা।

(৭) তদ্ভিন্নভাষাবাদীরা প্রতিপাদন করেন,—মাতৃকাবর্ণমালার প্রকারান্তরে উচ্চারণে ভাষা চতুর্বিধ :—

(ক) পরা—মূলাধার হইতে উদ্‌গত একনাদাত্মক বাক্ বা ভাষা 'পরা' নামে অভিহিত।

(খ) পশ্যন্তী—নাদসূক্ষ্ম, অতএব দুর্নিরূপ অর্থাৎ ইহার নিরূপণ দুষ্কর, এই হেতু 'পরা' হৃদয়গামিনী হইলে পশ্যন্তী নামে কথিত হয়। ইহা যোগীরা দেখিতে পান, এই হেতু ইহা 'পশ্যন্তী'।

(গ) মধ্যমা—'পরা' বুদ্ধিগত ও বিবক্ষাপ্রাপ্ত হইলে 'মধ্যমা' হয়। হৃদয়নামক মধ্যে উদীয়মান হয় বলিয়া ইহা 'মধ্যমা'।

(ঘ) বৈখরী—'মধ্যমা' মুখবিবরস্থ হইয়া কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ব্যাপারে যখন বহির্গত হয়, তখন তাহা 'বৈখরী' নামে অভিহিত হয়।*

এইরূপে চতুর্বিধ বাক্‌পদসমূহ পরিচিত। স্বাধীনমনাঃ রবাখ্য শব্দব্রহ্মের অভিজ্ঞ যোগিগণ এই 'পরা' প্রভৃতি পদচতুষ্টয় জানেন। ইহাদের মধ্যে পরা প্রভৃতি ত্রিবিধ পদ হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী, অতএব গুহানিহিত। 'বৈখরী' নামক চতুর্থ পদ সকল মনুষ্যই বলেন। ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ নামাখ্যাতাদি পক্ষে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগবিৎ বাগ্‌যোগী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ নামাখ্যাতাদি জানেন; বাগ্‌যোগে অনভিজ্ঞ পামরগণ চতুর্থ ভাগ বৈখরী ব্যবহার করেন, অর্থাৎ অর্থ প্রকাশার্থ প্রকাশ করেন।

সাহিত্যদর্পণে 'পরা' প্রভৃতি চতুর্বিধ শব্দের বিবৃতি :—( অনুবাদ ) জ্ঞাত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় তদ্‌বোধক শব্দ নিষ্পাদনার্থ প্রাণিপ্রেরিত অন্তঃকরণ মূলাধারস্থ অনলকে চালিত করে। সেই চালিত অনল তৎস্থানবর্ত্তী বায়ুর চালনার্থ প্রসার প্রাপ্ত হয়; সেই চালিত বায়ুতে সেই স্থানে সূক্ষ্মরূপে উৎপাদিত শব্দ 'পরা' নামে অভিহিত। নাভিদেশ পর্য্যন্ত চালিত বায়ু তদ্দেশসংযোগ হেতু যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা 'পশ্যন্তী' নামে ব্যবহৃত। এই দুইটি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর বলিয়া ঈশ্বরের ও যোগিগণের শ্রুতিগোচর, আমাদের নহে। সেই বায়ু হৃদয়দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়সংযোগে যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা 'মধ্যমা'। কর্ণাচ্ছাদন করিলে ইহা ধ্বন্যাত্মক বলিয়া সূক্ষ্মরূপে কদাচিৎ আমাদেরও শ্রুতিগোচর হয়। মুখ পর্য্যন্ত সমাগত সেই বায়ু কণ্ঠদেশে আসিয়া মূর্দ্ধায় আঘাত করে এবং মূর্দ্ধপ্রতিঘাতে পরাবৃত্ত হইয়া মুখবিবরে কণ্ঠাদি অষ্ট উচ্চারণস্থানে স্বীয় অভিঘাতে যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা 'বৈখরী' নামে কথিত।—সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় শ্লোকধৃত টীকা।

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তদীয় 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় 'পরা' প্রভৃতি চতুর্ব্যূহরূপ ভাষা উদাহরণ-সংযোগে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন।—

"অনভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা 'পরা'নাম্নী ভাষা প্রথমা, যেমন অভিনব কুমারদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা পশ্যন্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়, যেমন প্রাপ্তবৎকিঞ্চিদ্‌বয়স্ক বালকবাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা, যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্‌বয়স্ক শিশুভাষা। তার পর বাক্যরূপ বৈখরীনামধেয়া সকলশাস্ত্রস্বরূপা বিবিধজ্ঞানপ্রকাশিকা

---

* "বৈখরী শব্দনিষ্পত্তের্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা। দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।"—কুমারসম্ভব ২.১৭, মল্লিনাথটীকা।

সর্ববব্যবহারপ্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জাতমাত্রবালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্যূহরূপা ভাষা অস্মদাদিতে যুগপৎপ্রবর্ত্ত-মানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরীরূপ চতুর্ব্যূহরূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।

ইহার প্রমাণ এই। দূরবর্ত্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণবিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনান্তর সমনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসনভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। তদনন্তর হট্টনিকটপ্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারী পুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব অস্মদাদি-ভাষা চতুর্ব্যূহরূপে প্রতীয়মানাভাষাত্বহেতুক পূর্বোক্তক্রমে হট্টস্থ পুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষভাষার চতুর্ব্যূহরূপত্বনিশ্চয় হয়।"—বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ১৭০০ পৃষ্ঠা।

---

# পুথির শেষ কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আমরা প্রাচীন পুথির বিষয়বস্তু, লিপি, কাল ও উপকরণ লইয়া আলোচনা করি—মলাটের চিত্র ও কারুকার্যের বিচার করি। কিন্তু পুথির লেখক বা মালিকের কথা তেমন চিন্তা করি না। পুথির বিবরণ যাঁহারা সংকলন করেন, তাঁহারাও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন না—ফলে ইঁহাদের নিজস্ব কথা, যাহা সাধারণতঃ পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, তাহা বিবরণের মধ্যে তেমন স্থান অধিকার করে না—অনেক ক্ষেত্রেই ইহা পুরাপুরি উদ্ধৃত হয় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনাও এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি বর্তমান প্রবন্ধে পুথির এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত প্রসঙ্গের প্রতি পুথিরসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে যাঁহারা পুথির বিবরণ সংকলন করিবেন, তাঁহারা এই বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত অবহিত হইবেন।

পুথির শেষের দিকে লিপিকর বা পুথির মালিকের যে সমস্ত উক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইতে সামাজিক ইতিহাসের দিক্ দিয়া মূল্যবান্ অনেক তথ্য সংকলিত হইতে পারে। পুথি সাধারণতঃ নিজের ব্যবহারের জন্যই নকল করা হইত—তবে অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জন বা দানও ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেখা যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্মশাস্ত্রে পুস্তকদানের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। লিপিকরেরাও তাহার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত প্রশস্তিসংগ্রহ নামক গ্রন্থে লিপিকরদিগের এইরূপ বহু উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯, ২৭, ৩১, ৩৮, ৪৩, ৪৬, ৭১)। পুথি নকল করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার উল্লেখও এই সব উক্তির মধ্যে রহিয়াছে। উপযুক্ত পণ্ডিতকে বা দেবমন্দিরে পুথি দান করিয়া অনেকে গৌরব বোধ করিতেন (প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।৩৭৫, ৩৮০, ৭৩৭, সোসাইটী [রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের পুথির বিবরণ] ৫।৩৭৩৫)। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পরেও বিত্তবান্ ব্যক্তিরা বিপুল ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের রাজা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারত ও তাহার অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ, রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ভাগবত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানেও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে গীতাদি গ্রন্থদানের রীতি প্রচলিত আছে।

তবে নিতান্ত গৌরবজনক না হইলেও পুথিবিক্রয়ের প্রথাও যে ছিল না, এমন নয়। অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া পুথি লিখিয়া দিতেন—অনেকে পুথি বিক্রয় করিতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুথি আলোচনা করিলে এ সম্পর্কে বিস্তর কৌতুককর বিবরণ সংকলন করা যাইতে পারে। আমি এখানে এই প্রসঙ্গে কিছু আভাস মাত্র দিতেছি। অতি প্রাচীন কাল

হইতেই যে অর্থের বিনিময়ে পুথির আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশস্তিসংগ্রহ নামক পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নকল-করা এইরূপ দুইখানি পুথির সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে ( ১।১৬১, ১৫৩ )। উনবিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে পুথি নকলের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশি ছিল বলিয়া রেভারেণ্ড ওয়ার্ড তাঁহার হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ৩২০০০ অক্ষর নকল করাইতে বার আনা বা এক টাকা দিতে হইত। তাঁহার মতে এই হারে মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থের পুথি নকল করাইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই হার বাড়িয়া চতুর্গুণ হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখন এই হার ছিল হাজার শ্লোক প্রতি চার টাকা।

পুথির মধ্যে এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহার কিছু কিছু উল্লিখিত হইতেছে।

১১৫৯ বঙ্গাব্দে নকল-করা কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের লিপিকর আত্মারাম ঘোষ লিখিয়াছেন :—

ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা। ( সোসাইটী ৯।৩২২ )

১১২৪ বঙ্গাব্দে নকল-করা মহাভারতের লিপিকরের উক্তি :—

ইহার দক্ষিণা সমাপ্ততা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হইয়া সশ্রদ্ধ্যা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল।

( সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৪৬৫ পৃঃ, পাদটীকা ৪ )

লিপিকর দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার ১১৩৫ সালে ( রাজচন্দ্র সন ১১৩৫ সাল মল্লাব্দ সন ১২৩৬ সাল ) চার কাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া কিরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণ লিখিতেছেন :—

সেইমত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে।
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে॥
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা।
সেই মত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা॥
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার।
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্ম্মকার॥
কর্ম্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া।
পুস্তকসাঙ্গতে বাবু দিবেন বস্ত্র যোরা॥
আমাকে গামছা দিবেন বহবার দুষি।
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি॥

বালিট্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ।
চারি কাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত॥

—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্তরঞ্জন-সংগ্রহ, পুথিসংখ্যা ৩০৩।

পুথির মূল্য সম্বন্ধে ওয়ার্ডের লেখা হইতে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক খণ্ড অমরকোষ বা মুগ্ধবোধের পুথির দাম ছিল তিন টাকা। ১৮১২ সালে পুজারি গোস্বামীর গীতগোবিন্দটীকার এক খণ্ড পুথি দশ আনায় বিক্রীত হইয়াছিল, এ কথা পুথিতেই লিপিবদ্ধ আছে ( সোসাইটি, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪ )। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্ননির্দিষ্ট পুথিগুলি পার্শ্বোক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন[১] :—

| | |
|---|---|
| কাব্যাদর্শ ( ২০০০ শ্লোক )··· | ১।০ |
| কবিবল্লভ চক্রবর্তীর মাঘটীকা··· | ৫৲ |
| নাগেশ ভট্টের রসমঞ্জরীপ্রকাশ ( ৯০০ অক্ষর )··· | ||০ |
| মল্লিনাথের কিরাতটীকা··· | ২।০ |

১২১৮ বঙ্গাব্দে লিপীকৃত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাঁচ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল—বিক্রয়ের সময় অবশ্য জানা নাই। পুথির প্রথম পত্রে এ বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে :—

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরী বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্দ্র সিল। মূল্য ৫ পাচ টাকা মাত্র। সাং বরকামতা গ্রামাৎ। ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫৭৪ সংখ্যক পুথি )

লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। পুথি নকলের কারণ নিঃসন্দেহে পুণ্যার্জনের লালসা। পাণ্ডিত্যানুরাগই পুথি সংগ্রহের মুখ্য কারণ। তবে ধনী ব্যক্তিরা অন্য পাঁচটা জিনিষের মত পুথি সংগ্রহ করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন। একজনের সংগৃহীত সকল পুথিই যে বর্তমানে একই স্থানে আছে, এমন নয়—অনেক স্থলে এগুলি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান করিয়া যেমন একজন গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে। বিশিষ্ট পণ্ডিত সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর পুথিশালার একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথিশালা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার পুথিগুলিরও হদিশ মিলিতে পারে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় আমরা কবীন্দ্রাচার্যের নামমুদ্রাঙ্কিত কয়েকখানি পুথি দেখিয়াছি।[২] এইরূপ

১। পুথিগুলি বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে দুইখানিতে নকল করাইবার খরচেরও উল্লেখ আছে। মাঘটীকার পুথি ১২১৮ বঙ্গাব্দে পনর টাকায় নকল করান হইয়াছিল। আর ১৭৩৬ শকাব্দে কিরাতটীকার জন্য ব্যয় হইয়াছিল সাত টাকা। মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারের ফলে পুথির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় পুথিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই পাইয়াছিলেন দেখা যাইতেছে।

২। বৃহতী (III. B. 125), ঋগ্বেদসায়ণভাষ্য [ ৭৮৯—১ ( ১ ) ], বাশিষ্টলিঙ্গপুরাণ ( ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মসংগ্রহ ১৭০৪ )। প্রকাশিত কবীন্দ্রাচার্যগ্রন্থসূচীতে বৃহতীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, কামসূত্রের একখানি পুথি ( ৩১৩ ) বিদ্যানিধানের পুথির নকল বলিয়া মনে হয়।

নেপালের যুবরাজ বাহাদুর সাহের জন্ত ১৭১১ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি ও রণোদ্যোত সাহের আদেশক্রমে ১৮৭৭ বিক্রমাব্দে লিখিত আর একখানি পুথি ঐ পুথিশালায় আছে ( সোসাইটি ৮।৬৬৩৪, ৬৩০৮ )। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্ত সিংহের একখানি, গোপাল সিংহদেবের রাণীর একখানি এবং মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্ত লিখিত দুইখানি পুথি আছে ( ২৩৮, ২৬২, ১৩৬, ১৩৭ )।

পুথির লিখন-পঠন রমণীসমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহদেবের পত্নী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবীর স্বহস্তলিখিত প্রেমবিলাসের একখানি পুথি আছে ( ২৬২ )। মহিলাদের পাঠের জন্ত লিখিত পুথি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক উভয় ভাষাতেই বিস্তর পাওয়া যায়। জয়ন্তী দেবীর পাঠের জন্ত লিখিত শঙ্করাচার্যের সৌন্দর্যলহরীর একখানি পুথি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে (সোসাইটি ৮।৬৬৮২)। রমণীদের পাঠার্থে লিখিত বহু জৈনগ্রন্থের উল্লেখ প্রশস্তিসংগ্রহে পাওয়া যায় (২।পৃঃ ১৯৭, ৭০৯, ৭৩৫, ৭৪২ প্রভৃতি)। মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্ত লিখিত দুইখানি পুথির কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিকপূর্ব যুগেও মহিলাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন নিতান্ত কম ছিল না। সাধারণ লেখা-পড়া যে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষী রামনারায়ণ ধুপীলিখিত রামায়ণের অযোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ডের পুথি ( পরিষৎ ১৫১ ), শ্রীসাহ মহম্মদলিখিত রামায়ণ সুন্দরকাণ্ডের পুথি ( পরিষৎ ৫২ ), শ্রীকাত্তিক নাইর জন্ত বা তৎকর্তৃক লিখিত চৈতন্যমঙ্গল ( পরিষৎ ২২৪ ), শ্রীচন্দ্রনারায়ণ পুণ্ডরির জগন্নাথবিজয় ( ২৮৩ ), গোবর্দ্ধন জুগীর চৈতন্যমঙ্গল ( ২২০ ) ও শ্রীটৌকানি যুগীর ভ্রমরগীতা ( ২৯১ ) প্রভৃতি পুথি।

অনেক পুথির শেষে সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আছে লিপিকরদের ত্রুটি স্বীকার, পুথির দীর্ঘজীবন কামনা ও ইহার সংরক্ষণের আবেদন, পুথি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ এবং লেখক, পাঠক, মালিক, সকলের মঙ্গলকামনা। ইহাদের রচয়িতা বা রচনার কাল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন পুথিতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রান্তের পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলি প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। সুপরিচিত 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ' ইত্যাদি কবিতাটি একাদশ শতাব্দীর একখানি পুথিতে পাওয়া যায় ( সোসাইটি ৮।৬১১০ )। 'লেখকো নাস্তি দোষকঃ' এই অংশটি পুরুষোত্তম দেবের ( আনুমানিক দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর ) ভাবাবৃত্তি গ্রন্থে ( ২.২.২৪ ) উদ্ধৃত হইয়াছে। 'প্রশস্তিসংগ্রহে' উল্লিখিত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একাধিক গ্রন্থেও কতকগুলি কবিতা পাওয়া যায় ( ১।৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ৯২, ১১১, ১৫৪ প্রভৃতি )। বাংলা পুথিতে ইহাদের অনেকগুলি বিকৃতরূপে বা অনূদিত আকারে স্থান পাইয়াছে। কিছু কিছু নূতন নূতন অভিশাপ বা দিব্যও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কবিতাসরস্বতীর

আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া গদ্যের মারফতও 'দিব্য'-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। সংস্কৃতেও একখানি দ্বাদশ শতাব্দীর পুঁথিতে পুঁথিরক্ষায় একটি আবেদন গদ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে ( সোসাইটি ৩।১৯২৪ )।

বর্তমান প্রবন্ধে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি বহুলব্যবহৃত উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। ইহাদের ব্যাপক সংগ্রহ ও সমালোচন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

লিপিকরের ত্রুটি স্বীকার :—

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিদোষকঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ ( সোসাইটি ৮।৬১১০ )
যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া।
যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষো ন দীয়তে॥
( প্রশস্তিসংগ্রহ ১।১৭, ১৮, ২০, ২৭, ৯৫, ১১১ )।

অদৃষ্টদোষাৎ স্মৃতিবিভ্রমাদ্ বা
যদর্থহীনং লিখিতং ময়াত্র।
তৎ সর্বমার্যৈঃ পরিশোধনীয়ং
কোপো ন কার্যঃ খলু লেখকায়॥
( প্রশস্তিসংগ্রহ ২।৫২৫, ১২৬১, তাঞ্জোর বিবরণ ১ পৃ. ২২, ৪ পৃ. ২৩৬৮ )

যথা দিষ্ট তথা লিখিতং কহেন দ্বিজবর।
দোষগুণ না লইবেন যাইট বা জীত অক্ষর॥
( পরিষৎ-পুথি, ২২৯ )

লিখিলাম পোথা দোষ ক্ষেমিবে আমার।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছার॥ ( পরিষৎ-পুথি—৭০ )
ভিম রাদি জুর্দ্ধ মানা রোনে হয় ভঙ্গ।
মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ॥ ( পরিষৎ-পুথি—২৮৫ )
শাস্ত্র অধিকারী দেবী সরস্বতী মাতা।
তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা॥
মহাবল হয় দেখ হস্তী মহাশয়।
তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয়॥
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ—৩। পৃঃ ৬৫৪-৫ )।

লিখনের নাঞি দোষ এই ত বিচারি।
কদাচিৎ তায় যদি হয় ভুল ভ্রান্তি।
ভীষ্মের সময়ে ভঙ্গ মুনিভ্রমে মতি।

শশীর সন্তান তাহে অমর মিলন।
এত দূরে এই পুথি হইল লিখন॥

( ঐ—৫৫২ সংখ্যক পুথি )

অপহরণকারীর তিরস্কার :—

যত্নেন লিখিতং চেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ॥

( সোসাইটির পুথি সংখ্যা ৫২০৪ )

পুস্তকং হরতে যস্তু কাণো দুঃখী ভবেন্নরঃ।
মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছেত্তু পিতরং নরকং নয়েৎ॥

( কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির বিবরণ, ৫।৭৬ )

অর্জ্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেহনঘ।
হর্তুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ॥

( তাঞ্জোর বিবরণ, ১৮।১৪৫৮৫, সোসাইটি ৮।৬০৬২ )

আত্মনো হ্যুপকারায়োপকারায় পরস্য চ।
ইদং হরতি যো মূঢ়স্তস্য তাতঃ পশুর্ধ্রুবম্॥

( সোসাইটি, ৭।৪৯৭৫ )

চৌর্য্যেণ নীত্বা বিষমেব ভুক্ত্বা।
পিত্রা চ সার্দ্ধং সহ নারকী স্যাৎ॥ ( সোসাইটি ৭।৫৫৮৯ )

দুঃক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা শাধিং পিতা সুকরং জর্ম্মে জর্ম্মে

( পরিষৎ-পুথি—১৭২ )

এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে। সে শাসুরে হইবেক যার পুত্রবধুকে হরণ করিবে

( পরিষৎ-পুথি—২৮৫ )

এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি। সে বিরাণ্ডা হইবেক ( পরিষৎ-পুথি—৩৩১ )

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৬৬৭ সংখ্যক পুথির বিবরণেও অনুরূপ উক্তি লক্ষণীয়।

এ পুস্তক যে হরিবেক তাহাকে গোব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক।

( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ—৩।৫৫২ )।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই জাতীয় 'দিব্য' বাঙ্গালীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মনে পড়ে, আমরা বাল্যকালে আমাদের ছাপা বইয়েও এইরূপ কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতাম। এখনও আধুনিক ধরণের কিছু কিছু ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতেও বই সম্বন্ধে নানারূপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Wilson Bulletin for Books নামক পত্রে কয়েকটি ছড়া বা Book Rhyme সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তুলনার জন্য আমি এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

Steal not this book, my honest friend
For fear the gallows should be your end.
And when you die the Lord will say
And where's that book you stole away ?
Look ye, my friend,
If this book I lend,
Be sure to return,
Or in hell you will burn.
Remember, Book, my cozy shelves
From which my friends help themselves.
And like a dove with wings unloosed
Return, come back, fly home to roost.

পুথির সংরক্ষণ ও দীর্ঘজীবন কামনা :—

ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তব্ধদৃষ্টিরধোমুখম্ ।
কষ্টেন লিখিতং গ্রন্থং যত্নেন প্রতিপালয় ॥

( সোসাইটি, ৮।৬১১৪, প্রশস্তিসংগ্রহ, ১।১১১, ২।৬৬৬ ) ।

উদকানলচৌরেভ্যো মূষকেভ্যস্তথৈব চ ।
রক্ষণীয়া প্রযত্নেন যস্মাৎ কষ্টেন লিখ্যতে ॥

( প্রশস্তিসংগ্রহ, ১।১০৮, ১৪২ )

তৈলাদ্ রক্ষেজ্জলাদ্ রক্ষেদ্ রক্ষেচ্ছিথিলবন্ধনাৎ ।
মূর্খহস্তে ন দাতব্যমেবং বদতি পুস্তকম্ ॥

( প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।১৫৪, ২০০, ৬৩৭, ৬৬৬, ৭৪০ )

যাবল্লবণসমুদ্রো যাবন্নক্ষত্রমণ্ডিতো মেরুঃ ।
যাবচ্চন্দ্রাদিত্যৌ তাবদিদং পুস্তকং জয়তু ॥

( সোসাইটি, ৮।৬১৪০, প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।১০৮২ )

মঙ্গলপ্রার্থনা :—

শ্রীরস্তু সর্বজগতাং শ্রীরস্তু লেখকে ময়ি ।
শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥

( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৪।১৬২-৩ )

মঙ্গলং লেখকানাং চ পাঠকানাং চ মঙ্গলম্ ।
মঙ্গলং সর্বলোকানাং ভূমিভূপতিমঙ্গলম্ ॥

( প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।১১১৮, ১১৩৭, ১২২৮, ১২৫৫ ) ।

# বাঙ্গালার মূর্ত্তিবিদ্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১

এক সুপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তিবিদ্যাবিশারদ (Iconographist) বলিয়াছেন,—মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঙ্গালা দেশ(*১)। কলিকাতায় অবস্থিত ভারতীয় মিউজিয়ামের (Indian Museum) পুরাতত্ত্ব বিভাগে (Archaeological Section) সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল প্রস্তর, পোড়ামাটি (Terracotta), এবং ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেগুলির গঠনভঙ্গী ও খোদাই অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, মধ্যযুগের (*২) কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিশাল বঙ্গে, বিশেষ করিয়া পাল এবং সেন-রাজবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালী ভাস্করগণ ভারতবর্ষের মূর্ত্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি নূতন স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (ভট্টশালী মহাশয়ের মন্তব্য এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য)।—সে এক অপূর্ব্ব শৈলী (Style), বিশ্বের মূর্ত্তিবিদ্যার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।(*৩) বাঙ্গালা দেশে এই মূর্ত্তিবিদ্যার বিকাশের ধারাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলে কেবল মাত্র যে ভারতবর্ষের মূর্ত্তিবিদ্যার ইতিহাসের নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা নহে; আমাদের অলিখিত সভ্যতার ইতিহাসের (*৪) এবং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্ম্মজীবনের মর্ম্মকথা ও

---

(*১) ("The rule of the Palas was undoubtedly the most glorious period of Bengal's history. The earlier kings, such as Dharmmapala and Devapala, were very powerful princes of their time in Northern India. Flourishing schools of sculpture arose all over country and Taranath has preserved for us the names of two master-sculptors, Dhimana and his son Vitapala. But thousand other sculptors like these two, working in thousand different centres of culture, rapidly covered the country with a multitude of images, the mutilated remains of which still evoke everybody's admirations. Any one who has travelled in the villages of Bengal with open eyes, will be able to support the statement that there was hardly a single settled village in Pre-Muhammadan Bengal that had not its Buddhist and Brahmanical deities in stone and metal."—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, by Nalinikanta Bhattasali, M. A., Curator, Dacca Museum. (p. 9.).

(*২) সমগ্র আলোচনার মধ্যে মধ্যযুগ বলিতে এখানে ৮ম হইতে ১৩শ খৃষ্টাব্দের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধরা হইয়াছে।

(*৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মিউজিয়াম, কলিকাতা, বারেন্দ্র-রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার সংগ্রহমালা হইতেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

(*৪) জগদ্বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডক্টর ভি, গর্ডন, চাইল্ড, ডি, এসসি, মহাশয় বলিয়াছেন—

"Archaeology furnishes a sort of history of human activity, provided always that the actions have produced concrete results and left recognizable material traces.........It has

আচার-পদ্ধতির বহু নির্ভরযোগ্য কাহিনী অবগত হওয়া যাইবে। ("A time has come when our history must be examined and written by us from our own point of view, from the point of view of onr development and culture, our literature and art, our achievements.")

২

মূর্ত্তিবিদ্যার ( ভাস্কর্য্যের ) ইংরাজী নাম আইকনোগ্রাফি (Iconography), গ্রীক শব্দ ইকন্ ('ikon') হইতে আইকনোগ্রাফি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহা আরাধ্য দেব-দেবীর বা উল্লেখযোগ্য কোন মহাপুরুষের প্রতিকৃতিকে বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে মূর্ত্তিবিদ্যার এই প্রকারের কোন বিশেষ একটি নাম নাই ; এই বিশেষ বিদ্যা ভাস্কর্য্যের বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদিক আর্য্যগণ সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্য দেব-দেবীকে ধ্যান বা ধারণার মধ্য দিয়া স্মরণ বা উপাসনা করিতেন, অধ্যাপক Max Muller সাহেব বলিয়াছেন : "The religion of the Veda knows no idols." ঋগ্বেদের বা অথর্ববেদের যে সকল শব্দ হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'আর্য্যগণের মধ্যে লিঙ্গ উপাসনা পদ্ধতি ( Fetishistic symbol) প্রচলিত ছিল', তাঁহাদের উক্ত মন্তব্যগুলির মূলে বহু ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের একান্ত অভাব রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ( এবং পুরাণের ) যুগে লিঙ্গ উপাসনার উৎপত্তির যে সামান্য বিবরণ রহিয়াছে, তাহা হইতেও মূর্ত্তিবিদ্যার কোন বিশেষ একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। 'বিগ্রহ' এই শব্দ হইতে বেদের অধিকতর পরবর্ত্তী কালের রচিত সাহিত্যে ভারতবর্ষে মূর্ত্তিবিদ্যার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। ( গ্রীক শব্দ 'ইকন'এর সহিত 'বিগ্রহ' শব্দের উদ্দেশ্যগত এবং অর্থগত সমন্বয় রহিয়াছে)। এই তো গেল আর্য্যদের কথা। কিন্তু প্রাক্-আর্য্যযুগে যদিও যোগ সাধনা বা ধ্যানযোগ সিন্ধুধর্ম্মের divine attribute বা দেবত্বের পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত ( ৩৫ ), তবুও দ্রাবিড়দের মধ্যে লিঙ্গ-

---

enlarged the spatial horizon of history in much the same degree as the telescope enlarged astronomy's vision of space. It has extended history's view backward in time a hundred-fold, just as the microscope revealed to biology beneath the surface of gross bodies the lives of infinitesimal cells Finally, it has altered the content of *historical study* in much the same sort of way as radio-activity affected chemistry. For one thing, archaeology is largely concerned with practical everyday things, contrivances and inventions like houses, drains, axes, and internal-combustion engines, that in themselves have affected the lives of far more people, and that far more profoundly, than any battle or conspiracy, but that *formerly seemed* beneath the dignity of *scholarly history*."—Dr. V. Gordon Childe, *Progress and Archaeology* ( London, 1944 ), p. 1.

( ৩৫ ) 'সিন্ধুধর্ম্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য' ( প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল ) শ্রীননীমাধব চৌধুরী, (পৃ ১২৪-১৩১)।

উপাসনা এবং বিশেষ ধরণের মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল ( ৩৬ )। স্যর জন মার্শাল, দয়ারাম সাহনী মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় বহু পোড়ামাটির মূর্ত্তি (terracotta figure) ও নানারূপ চিত্রলিপি হইতে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

৩

বাঙ্গালা দেশে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রধান বিষয়বস্তু—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিভিন্ন দেব-দেবীকে আগম ও তন্ত্রের ধ্যানানুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে রূপ দান করা। ( বাঙ্গালা দেশে এত বিভিন্ন ধরণের দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবার একমাত্র কারণ, মধ্যযুগে এখানে বহু তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল )। মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য বাঙ্গালী ভাস্করগণ মূলত প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ এবং মাটি ব্যবহার করিতেন ("The materials recommended in the Agama for making imges are wood, stone, precious gems, metals, earth and also a combination of two or more of the aforesaid materials.") কিন্তু উত্তর-ভারতের মূর্ত্তিবিদ্যালয়গুলির ( গান্ধার, মথুরা, মগধ, কৌশাম্বী ) বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, উহা মূলতঃ বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর এই বিষয়ে Grunwedel সাহেব বলিয়াছেন: "The religious character, so deeply rooted in the national life of the Indian races, has also continued the guiding principle in the art." ( *Buddhist Art in India*, p. 1. )

আগম এবং শিল্পী,—অধ্যাপক রাও মহাশয় বলিয়াছেন: "The artist thus became handicapped and his imagination had no freedom of action. Not much scope could be given to the display of the genius of the artist, under any circumstances, although there is an Agama rule to the effect that the artist should fashion the images as best as he could." (*Development of Hindu Iconography*). ভারতবাসীর জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের ব্যাপকতা এবং গভীরতাই তাহার চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্যের উপর প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাতীত দেব-দেবীর মূর্ত্তি এই উক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত; কেবল মাত্র ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর নয়, সৌন্দর্য্যসাধক ভারতবাসীর সংস্কৃতির মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে হইলে এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবহমাণ ধারার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিতে হইবে।

---

( ৩৬ ) উদাহরণস্বরূপ মহেঞ্জোদাড়ো হইতে প্রাপ্ত একটি চিত্রিত গোলাকার ( আনুমানিক ১½ ইঞ্চি ব্যাস ) সূর্য্যমূর্ত্তির কথা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। পাটনায় সরকারী মিউজিয়ামের কিউরেটার মহাশয়ের আমন্ত্রণে যখন গত বৎসর ( ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ) পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা হইতে আবিষ্কৃত বিষয়বস্তুগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম, তখন উক্ত অদ্ভুত সূর্য্যমূর্ত্তিটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়।

## ৪

বাঙ্গালা দেশে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই মধ্যযুগের নির্ম্মিত। ইহা হইতে অনেকে ধারণা করেন যে, পাল এবং সেন-রাজবংশের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিশেষ প্রচলন ছিল না ( *৭ )। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ভারত-সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের মুখ্য পরিচালক এন, কে, দীক্ষিত মহাশয় বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার পখরণা গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'পখরণা বাঙ্গালাদেশের মধ্যে পোড়ামাটির মূর্ত্তিনির্ম্মাণের প্রাচীনতম ক্ষেত্র।' আর ঐ মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই ২য় হইতে ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত, অতএব পখরণা বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইতিহাসসম্মত প্রাচীনতম মূর্ত্তিবিদ্যাক্ষেত্র। বাঁকুড়া জেলায়, সিংভূম ও মানভূম জেলায় এমন শতাধিক মূর্ত্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পূর্ব্বমধ্যযুগ বা তাহার আরও পূর্ব্বের নির্ম্মিত। শুশুনিয়া গিরিলিপির মধ্যে গোলাকার শিখাযুক্ত সুন্দর বিষ্ণুচক্র এই মূর্ত্তিবিদ্যালয়ের একটি জীবন্ত স্মৃতি, লিপির অক্ষরগুলি সুন্দর, সরল ও স্পষ্ট এবং উহা হইতে প্রাচীন বঙ্গের লিপিকুশলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ( *৮ )।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কালে বাঙ্গালাদেশে বা বিশাল বাঙ্গালায় প্রধানতঃ দুইটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যবহুল মূর্ত্তিবিদ্যালয় ( School of Iconography ) ছিল।

( ১ ) দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালার ( বা রাঢ়ের ) মূর্ত্তিবিদ্যালয় ( Radha School of Iconography )।

বর্ত্তমান সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের পূর্ব্বের সামান্য অংশ এবং ধলভূম, মানভূম, সিংভূম, উত্তর-পূর্ব্ব উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বিহার লইয়া ২য় ও ৩য় হইতে ১২শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মূর্ত্তিবিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ( বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এইটিই প্রাচীনতম মূর্ত্তিবিদ্যালয় )।

( ২ ) উত্তরবঙ্গের গৌড় মূর্ত্তিবিদ্যালয় ( Gouda School of Iconography )।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম-দক্ষিণ কামরূপ ও বিহার লইয়া ৭ম হইতে ১৩শ খ্রীষ্টাব্দের ( মধ্যযুগে ) মধ্যে এই বিদ্যালয়টি বৌদ্ধ এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

---

( *৭ ) "ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্যশিল্পের ইতিহাসে বাঙ্গালার মূর্ত্তিকলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকলেও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার মূর্ত্তিশিল্পের কোনও নিদর্শন বাঙ্গালার মাটিতে আজ পর্য্যন্তও খুব পাওয়া যায় না।"—'বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য', ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালা হইতে প্রকাশিত )শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

( *৮ ) ( ক ) "According to the some scholar, is identical with the hero of the Susunia (in the Bankura district) inscription, which has been assigned to the 4th century A. D. (Ep Ind., Vol. XIII., p. 133 ff.)—Some Historical Aspects of the Inscription of Bengal. By Dr. Benoychandra Sen, M, A., Ph. D., (p. 137).

( খ ) Eur-Asia, (International Monthly Journal), June, 1950, (p. 450 to 456), The Susunia Rock Inscription, By Rabindranath Choudhuri.

৫

উপযুক্ত নামের অভাবে প্রথম মূর্ত্তিবিদ্যালয়টিকে আমি রাঢ়-মূর্ত্তিবিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

রাঢ় ( বা রাঢ়গঙ্গা ) বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বের ভূভাগকে বুঝায়। আলেকজাণ্ডারের সময়ে গ্রীক ঐতিহাসিক Ptolemyর বিবরণ হইতে আমরা প্রাচীন রাঢ়ের একটি ভৌগোলিক বিবরণের আভাস পাই : "As to the situation of the Gangarides, the only information afforded by Ptolemy is that they held all the country about the mouths of the Ganges, which might include the whole delta, and that their territory contained the royal city of Ganga in long. 146° ; lat. 19°15′. Neither Gangarides nor Ganga can be identified with any name occurring in India literature ('Outline of Geography') ( Geographike Hyphegesis ) of Clandius Plotemaeus ( Ptolemy )." (* ৯)। বিষ্ণুপুরাণ হইতেও আমরা এই প্রাচীন ভূমির উৎপত্তির কিছু কিছু ইতিহাস জানিতে পারি।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে এই বিদ্যালয়ের মূর্ত্তিগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

( ১ ) জৈন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেব-দেবী।

প্রাচীন রাঢ় মূলতঃ জৈনধর্ম্মপ্রধান দেশ। প্রবাদ আছে, জৈন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাবীর ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যখন বজ্রভূমে ( বা দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে ) আসিয়াছিলেন, তখন সেখানকার ভূমিজরা তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল ( * ১০ ), কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহারা উত্তরগামী জৈন ধর্ম্মের প্রবল স্রোতকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহার প্রমাণস্বরূপ উক্ত অঞ্চলের শত সহস্র জৈন ধর্ম্মের দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ৭ম খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েনের ভারতভ্রমণের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাদেশে জৈন ধর্ম্মমতবাদের বিশেষ প্রচলন ছিল।

( * ৯ ) 'The Early History of Bengal' · By F. G. Monahan, I. C. S. (p. 204.)

( * ১০ ) "Colonel Dalton identifies the Bhumij with the 'Vajra-Bhumi' of the Jain legendary history, who hunted with dogs and arrows with deified saint Mahavir, when engaged in performing an ascetic pilgrimage through their country. This conjecture is strongly supported by the prevalence of Jain remains in many parts of Manbhum District, and by the *tradition of* both Bhumij *and Hos that a people called Sarawakas who can* hardly be other than Jains, were the earliest civilised inhabitants in Manbhum and the eastern portion of Singbhum. ( Journal of the Asiatic Society for 1866, p. 186. ) —A Statistical Account of Bengal, (Vol. XVII.) : By W. W. Hunter, B. A., LL. D., (p. 278.)

( ক ) জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের ( মধ্যযুগের পূর্ব্বে নির্ম্মিত ) অলঙ্কারহীন, স্থূল, উলঙ্গ এবং আদিম মৌলিক প্রথায় দণ্ডায়মান পার্শ্বনাথ, মহাবীর এবং জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি।

( খ ) মাথায় মুকুট, বৈদিক প্রথায় বস্ত্র উত্তরীয়, মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেব-দেবীর ন্যায় আপাদমস্তক স্থূল অলঙ্কারমণ্ডিত জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈন দেব-দেবীর মূর্ত্তি, ( এই মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই মধ্যযুগের মধ্যে নির্ম্মিত )।

( গ ) জৈন স্তূপও এই বিদ্যালয়ের মধ্যে দেখা যায়।

( ২ ) বৌদ্ধ ধর্ম্মের দেব-দেবী।

মধ্যযুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্ম্ম, হীনযান এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণের ফলে এক অভিনব মিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ( উহা মূল বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র )।

রাঢ়ের পূর্ব্বাংশে ও গৌড়ে ( পাহাড়পুরে ) বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ( প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর রাঢ়ের মধ্যে ছিল )। এখনও পশ্চিমবঙ্গে অনেক প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায় ( * ১১ )।

পূর্ব্ব এবং প্রথমমধ্য যুগের মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, তারা, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি মূর্ত্তি এবং প্রস্তর ও ইটের বৌদ্ধ স্তূপ ( * ১২ ) এই বিদ্যালয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ( মগধের অন্তর্গত অবর মূর্ত্তিবিদ্যালয়গুলির মধ্যে যে একটি গতিশীলতা ও প্রাণাবেগের ছাপ রহিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রভাব এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে দেখা যায় না )।

( ৩ ) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবী :

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রায় সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তিই এই বিদ্যালয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ( মূর্ত্তিগুলি প্রায় সব মধ্যযুগের )। গৌড়মূর্ত্তিবিদ্যালয়ের জীবন্ত ছাপ রাঢ়ের সূর্য্য, দুর্গা এবং বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে দেখা যায়, তবে ইহার সংখ্যা অল্প এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া সঠিক ভাবে বলা যায় না যে, মধ্যযুগের মধ্যে বঙ্গের এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল )।

এই অধ্যায়ের মধ্যে পুষ্করণা ( বা পখরণা ) অবর মূর্ত্তিবিদ্যালয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

শুশুনিয়া গিরিলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুষ্করণার ( বা বর্ত্তমান বরজোড়া থানার অন্তর্গত দামোদরের তীরে অবস্থিত পখরণা গ্রাম ) বিষ্ণুভক্ত ( বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ) মহারাজা সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজা চন্দ্রবর্ম্মার রাজধানী ছিল। এই লিপি ৪র্থ খৃষ্টাব্দের,

---

( *১১ ) 'Modern Review,' (January, 1950),—'Buddhist Temple of Belera,' (p. 49.)—Rabindranath Chaudhuri.

( *১২ ) 'Ancient Indian Education (Buddhist and Brahmanical)' : By Dr. Radhakumud Mukerjee, M. A., Ph. D., (p. 498).

ভারতবর্ষে তখন গুপ্তযুগ।(*১৩) বর্ত্তমান পখরণাতে এই বিদ্যালয়ের আর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, অধিকাংশ দামোদরগর্ভে চলিয়া গিয়াছে, খননের সময় যে দুই দশটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই জন্য বর্ত্তমানে আর এই বিদ্যালয়ের কোন ধারাবাহিক গবেষণা সম্ভব নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালাতে পখরণার কয়েকটি দ্রষ্টব্য বিষয় রহিয়াছে। ( * ১৪ ) ( দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত রাঢ়ের কোন নিজস্ব মিউজিয়াম হয় নাই )।

পখরণার অধিকাংশ মূর্ত্তিই পোড়ামাটির। এই জন্য দীক্ষিত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, এখানকার ভাস্করগণ মূর্ত্তি গঠনের জন্য মূলত মাটি ব্যবহার করিতেন। কিন্তু শুশুনিয়া গিরিলিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ভাস্করগণ প্রস্তরের খোদাই-কার্য্যে সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। লিপিটির মধ্যে পখরণা মূর্ত্তিবিদ্যালয়ের traditional সংস্কৃতির ছাপ রহিয়াছে। আমি যে তিনটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পখরণা হইতে পাইয়াছি, তাহার বিবরণ এখানে দিতেছি।

( ১ ) একটি পোড়ামাটির (terracotta) বিষ্ণুমূর্ত্তি, ( ঠিক এই রকমের একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালাতে আছে ; ( * ১৫ ) মূর্ত্তিটি ২৪-পরগণা জেলায় পাওয়া গিয়াছে )। ১৯৪৭ সালে দামোদরের গর্ভে প্রায় ১২ ফুট নীচে বালির মধ্যে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে ( ৬ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি )। ( ২ ) একটি শক্ত বেলে পাথরের ( sandstone ), এইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের। মূর্ত্তিটির মধ্যে গতিশীলতা না থাকিলেও প্রাণাবেগ রহিয়াছে ( ৭ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি )। মূর্ত্তিটি ১০ ফুট নীচে একটি পুষ্করিণীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

( ৩ ) একটি মূর্ত্তি নরম ( অপেক্ষাকৃত ভাল ) বেলে পাথরের (sandstone), ( ৬॥০ × ৪ ইঞ্চি )। মূর্ত্তিটি সুন্দররূপে খোদাই-করা, অলঙ্কার দ্বারা শোভিত, প্রাণাবেগে পুষ্ট ও অপর দুটি মূর্ত্তি অপেক্ষা এটি অধিকতর পরবর্ত্তী কালের খোদিত।

ঐ তিনটি মূর্ত্তি ছাড়া আমি পখরণা হইতে কতকগুলি প্রাচীন মাটির ভাণ্ড, গ্লাশ, থালা, মাটির জালা ( *১৬ ) দামোদরের মধ্যে পাইয়াছি, ঐগুলি প্রায় সবই প্রথম-মধ্যযুগের। ( দামোদরের বন্যার পর দক্ষিণ তীরে নদীর মধ্যে ৮।১০ ফুট নীচে সারিবদ্ধ কূপ এবং অদ্ভুত ধরণের সব মাটির পাত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐগুলি সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই )।

---

( *১৩ ) 'Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India' (Vol. XIII.),—1915-16. No 9 (p. 133). The Susunia Rock Inscription, By M.M. Haraprashad Sastri.

( *১৪ ) 'History of Bengal' (Dacca University) : By Dr. R. C. Majumder, M.A. Ph. D. (P, 520).

( *১৫ ) 'বাংলার ভাস্কর্য্য' ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) চিত্র নং ২ বিষ্ণু,—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

( *১৬ ) এই ধরণের বিরাট ও ভারী মাটির জালা মগধ মূর্ত্তিবিদ্যালয়ের অন্তর্গত নালন্দা মহাবিহারে খননের সময় পাওয়া গিয়াছে।

৬

রাঢ়-মূর্তিবিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য :

( ক ) রাঢ়-মূর্তিবিদ্যালয়ের ভাস্করগণ মূর্তি নির্মাণের জন্য মূলতঃ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি ব্যবহার করিতেন :

(১) শ্লেট-পাথর, শতকরা ৩৫ ভাগ,

(২) কৃষ্ণ শক্ত পাথর, শতকরা ৩০ ভাগ,

(৩) বেলে পাথর, শতকরা ২০ ভাগ,

(৪) মাটি (terracotta), শতকরা ১০ ভাগ, ( এবং শতকরা ৫ ভাগ দারু এবং ধাতুনির্মিত মূর্তি এই বিদ্যালয়ের মধ্যে পাওয়া যায় )।

( খ ) খোদাইয়ের প্রথানুযায়ী মূর্তিগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) চিত্র (chitra) মূর্তি : এক খণ্ড প্রস্তর হইতে পূর্ণ মনুষ্যদেহের ন্যায় মূর্তির সমগ্র দেহ খোদাই করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পশ্চাদ্‌ভাগের কোন আবরণ নাই বা মূর্তি-দেহের কোন অংশ অবলুপ্ত নাই। ( এই প্রকারের মূর্তির সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ )।

(২) চিত্রার্দ্ধ (chitrada) মূর্তি : মূর্তি-দেহের সম্মুখ হইতে মাত্র অর্দ্ধাংশ ( বা ক্ষেত্রবিশেষে ⅔ হইতে ¾ অংশ ) খোদাই করিয়া বাহির করা হইয়াছে এবং বাকী অংশ পশ্চাতের মূল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে অবলুপ্ত রহিয়াছে ( প্রায় ৮০ ভাগ এই ধরণের মূর্তি এখানে দেখা যায়, এইগুলি স্থূল এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা প্রথম মধ্যযুগের )।

মন্দিরগাত্রের শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য এক প্রকারের প্রস্তর বা ইটের চিত্রার্দ্ধ মূর্তির ব্যবহার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। সব প্রাচীন মন্দিরগুলির গাত্রেই পুরাণের বিভিন্ন ধর্মকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে খোদাই করা দেখিতে পাওয়া যায়, ( মল্লরাজাদের, শেষ মধ্যযুগের নির্মিত বিষ্ণুপরের মন্দিরগুলির গাত্রে ইহার চরম বিকাশ আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে(*১৭) )।

( গ ) চরিত্রের দিক্‌ দিয়া এই বিদ্যালয়ের মূর্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) চল (movable) মূর্তি,

(২) অচল (immovable) মূর্তি ও

(৩) চল-অচল (movable-immovable) মূর্তি।

---

( *১৭ ) 'History of Bishnupore Raj' (An Ancient Kingdom of West Bengal)—By Mr. A. P. Mallik, B. A. B. T.

(১) চল-মূর্ত্তি : এই শ্রেণীর মূর্ত্তি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ভাবে আরাধনার জন্ত বা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্ত নির্ম্মিত হইত। ঐগুলি লঘু এবং আকারে ক্ষুদ্র।

(২) অচল-মূর্ত্তি : এই মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের মূল বিগ্রহরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিত এবং কোন অবস্থায় এইগুলিকে স্থানচ্যুত করা হইত না বা মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত না। মূর্ত্তিগুলি আয়তনে বৃহৎ এবং গুরুভারাক্রান্ত হইত।

(৩) চল-অচল মূর্ত্তি : এইগুলি সাধারণতঃ ১ম ও ২য়, এই উভয় কার্য্যের জন্ত ব্যবহৃত হইত।

# আদিশূরের প্রাচীন উল্লেখ

অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, এম. এ.

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাজা আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কুলগ্রন্থে রাজা আদিশূর এবং তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাসযোগ্য অপর কোন প্রমাণের পোষকতার অভাবে উক্ত কাহিনীর সত্যতা—এমন কি, আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান। সম্প্রতি একখানি প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থে আমি আদিশূর নামক এক বীরের উল্লেখ পাইয়াছি। ইনিই বিবাদাস্পদ রাজা আদিশূর কি না, তাহা নিরূপণের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট অংশটির প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আচার্য মণ্ডনমিশ্রকৃত 'বিধিবিবেক' মীমাংসা শাস্ত্রে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ মৈথিল দার্শনিক সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র উহার টীকা লিখিয়াছেন। টীকার নাম 'ন্যায়কণিকা'। উহাতে বাক্যের অর্থবিচার প্রসঙ্গে তিনি এই বাক্যটি উপস্থাপিত করিয়াছেন—**নিজভুজবীর্যমাস্থায় শূরানাদিশূরো** জয়তি [ ন্যায়কণিকা, কাশী সংস্করণ, পৃ. ২৯০ ]—নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আদিশূর শূর( বীর )দিগকে পরাজিত করেন।

বাচস্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। উক্ত বাক্যের 'জয়তি' পদে বর্তমান-কালসূচক বিভক্তি দ্বারা বাচস্পতি ও আদিশূর সমসাময়িক, এইরূপ ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত আদিশূরও বোধ হয়, এই সময়ই বর্তমান ছিলেন। সুতরাং বাচস্পতি যে আদিশূরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই এই আদিশূর, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাচস্পতি এ স্থলে একজন সাধারণ বীরমাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বাচস্পতি বঙ্গদেশের সন্নিহিত মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। উল্লিখিত বাক্যে তিনি বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের নাম ও মহিমার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সম্ভবপর। তাঁহার স্বদেশে অথবা নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানে আদিশূর নামে কোন বিখ্যাত রাজার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না।

ঐতিহাসিকেরা শূরবংশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আদিশূর সম্পর্কে এই উল্লেখের প্রামাণ্যও তাঁহাদের বিচার্য।

# আলোচনা

## পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ঠাকুরের ক্ষুদ্র অথচ অতীব মূল্যবান্ আবিষ্কার অতঃপর বাঙ্গলার ঐতিহাসিকগণ সকলেই সাদরে আলোচনা করিবেন, আশা করা যায়। আমরা এ বিষয়ে আমাদের মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১। বাচস্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক, পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। ন্যায়সূচির রচনাকাল ৮৯৮ বৎসর ("বস্বঙ্কবসুবৎসরে") বিক্রমাব্দ নহে, পরন্তু মিথিলায় ও পূর্ব্বাঞ্চলে চিরপ্রচলিত শকাব্দ বটে। বাচস্পতি 'তাৎপর্য্যটীকা'য় (কাশীর সং, পৃ. ৩৩৯) "যথাহ ভদন্তধর্ম্মোত্তরঃ" বলিয়া বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মোত্তরের "অপোহপ্রকরণ" গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ধর্ম্মোত্তর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বার্ধের লোক এবং ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান বাচস্পতির পক্ষে তাঁহার সশ্রদ্ধ নামোল্লেখ সম্ভবপর নহে। বাচস্পতি ভাসর্ব্বজ্ঞ ও ব্যোমশিবাচার্য্যের পরবর্ত্তী এবং কন্দলীকারের সমকালীন; কন্দলীকার বাচস্পতির যুগান্তকারী গ্রন্থসমূহের সহিত স্বল্প পরিচয়ও কুত্রাপি সূচিত করেন নাই। এতদ্বিষয়ে আমাদের ইংরাজী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Ganganatha Jha Research Institute Journal, vol. II., pp. 349-53)। সুতরাং বাচস্পতির উল্লিখিত "আদিশূরে"র অভ্যুদয়কাল হয় ৯৫০-১০০০খ্রীঃ মধ্যে।

২। গৌড়াধিপতি আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ বিপ্র আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ১২-১৪ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ বল্লালসেনের সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং এই আদিশূর কিছুতেই খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তির প্রমাণবলে তাঁহাকে পালবংশের পূর্ব্বে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত (সা-প-প, ৫২ খণ্ড, পৃ. ১০৭)। সুতরাং বাচস্পতির সমকালীন আদিশূর গৌড়াধিপতি আদিশূর নহেন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

৩। মিথিলানিবাসী বাচস্পতি তাঁহার উদাহরণ-বাক্যে ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিপতির উল্লেখ না করিয়া স্বদেশীয় পৃষ্ঠপোষক নরপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। সুতরাং গৌড়ের আদিশূরের ২০০।৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী মিথিলাধিপতি পৃথক্ আদিশূরের অস্তিত্ব এখন প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। এই "মৈথিল" আদিশূরের একজন বংশধর "বিশ্বম্ভর শূর" পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালী জিলার ভুলুয়া পরগণার আদি জমীদার ছিলেন। বিশ্বম্ভরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ সুবিখ্যাত "লক্ষ্মণ-মাণিক্য" সংস্কৃত ভাষায় বহু কাব্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই শূরবংশ ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও ক্রিয়াচারী উপবীতধারী ছিল। আমরা প্রবন্ধান্তরে ভুলুয়ার রাজবংশের বিবরণ লিখিয়াছি (I. H. Q, XIV, pp. 737-46; প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩৯৩-৯৯)। ভুলুয়া-সমাজের ইতিহাস বিন্দুমাত্র আলোচনা করিলে সন্দেহ

থাকে না যে, বিশ্বম্ভর মূলতঃ মৈথিল ছিলেন। তিনি "আদিশূরের বংশধর" ( কৈলাসচন্দ্র সিংহ-রচিত রাজমালা, পৃ. ৩৯১ ), অথবা "আদিশূরের নবম পুত্র" ( প্যারী-মোহন সেনকৃত নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ. ১৪ ) ছিলেন বলিয়া প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ "নবম পুরুষ" অর্থেই নবম পুত্র কথাটি প্রচারিত হইয়াছিল। মহম্মদ তুঘলকের সময় ( ১৩২৫-৩৫ খ্রীঃ ) বিশ্বম্ভর দেশত্যাগী হইয়া থাকিলে তাঁহার ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ আদিশূরের সময় প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হওয়া অসম্ভব নহে। কর্ণাটবংশের পূর্ব্বে মিথিলায় শূরবংশের রাজত্ব ছিল, নূতন আবিষ্কার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে। মিথিলায় এই শূরবংশ এখনও বাঁচিয়া আছে কি না, অনুসন্ধানযোগ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুলুয়ার শূরবংশের ইতিহাস এই নূতন আলোকে পুনরালোচিত হওয়া আবশ্যক। ভুলুয়ার ব্রাহ্মণসমাজের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়, যাহা বাঙ্গলা দেশের অন্যত্র কুত্রাপি কখনও বিদ্যমান ছিল না। আমরা দুইটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতেছি। ভুলুয়ায় রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, সপ্তশতী, বৈদিক প্রভৃতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান নাই। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—"মৈথিল" ও "গৌড়"। উভয় শ্রেণীতে আচারানুষ্ঠানগত পার্থক্য থাকিলেও বিবাহাদি সম্বন্ধ আবহমান চলিতেছে। মৈথিলদের পৃথক্ অস্তিত্ব বর্ত্তমানে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। একটি প্রসিদ্ধ বংশ গোত্রপরিবর্ত্তন করিয়া "ব্রহ্মহা" খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। "গৌড়"-শ্রেণীতে রাঢ়ীয় পঞ্চগোত্র ব্যতীত "কৌশিক," "ঘৃতকৌশিক" প্রভৃতি গোত্র মিশিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে "ভুলাই" ব্রাহ্মণদের সহিত সম্পর্ক অপবাদরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভুলুয়ায় একটি বিস্ময়কর প্রথা প্রচলিত ছিল যে, উপবীতধারী দুইজনের মধ্যে প্রথম পরিচয়কালে প্রশ্ন করা হইত—"আপনি ব্রহ্মকুল, না ক্ষত্রকুল?" ক্ষত্রিয়াচারী উপবীতধারী শূরবংশের ঐতিহ্য প্রশ্নটির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ভুলুয়ায় শূরবংশ জনতাবহুল এবং বহুতর গ্রামে বিদ্যমান। একটি স্থানীয় প্রবাদ আছে,—"শূর শূয়র মঁাদার, তিনে ভুলুয়া আঁধার"। তন্মধ্যে রাজগোষ্ঠীসম্ভূত সম্ভ্রান্ত শাখা "আদিশূর" নামে পরিচিত, বাজে শাখার নাম "পদীশূর"।

# মথুরানাথ তর্কবাগীশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপের আয়ুষ্কাল স্থূলতঃ ৫০০ বৎসর ধরা যায় ( ১৪০০—১৯০০ খ্রীঃ )। যে সকল মহাপণ্ডিতের গ্রন্থরচনা দ্বারা এই ভারতবিখ্যাত মহাবিদ্যালয়ের চরম অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় হইলেন "মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ"। তাঁহার একটি টীকাগ্রন্থ—মূল চিন্তামণির উপর "মাথুরী"—ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহাকে এযাবৎ চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে গ্রন্থকার মাত্রেরই জীবনীর প্রধান উপকরণ দ্বিবিধ—তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজি ও পারিবারিক বিবরণ। এই দ্বিবিধ উপকরণই সংগ্রহ করা বর্ত্তমান প্রগতির যুগে একান্তভাবে অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। এক দিকে নব্যন্যায়ের চর্চ্চা বাঙ্গলা দেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং মূল মাথুরীর কিয়দংশ পাঠ্য ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ প্রয়োজনাভাবে বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং তাহাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সুদূরপরাহত। অপর দিকে পিতৃপিতামহাদির নাম গ্রহণও এখন অনিষ্টবোধে পরিত্যক্ত এবং পারিবারিক কীর্ত্তিকথা অতল জলে বিসর্জ্জিত হইতেছে। ফলে, কতিপয় প্রবাদমূলক গল্পকথা ছাড়া বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন মহামনীষীদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না এবং ঐ গল্পকথাই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া সাধারণ্যে ও শিক্ষিত সমাজে প্রচার লাভ করিতেছে। মথুরানাথ সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল কথা মুদ্রিত হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই প্রবাদমূলক এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা এখন নিশ্চিতভাবেই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ সমস্ত প্রবাদ অমূলক ও প্রমাণবিরুদ্ধ।[১]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশের ৪ জন মহানৈয়ায়িকের বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচারিত হইয়াছিল :—

---

১। Ward সাহেবের "হিন্দু"-বিষয়ক বিরাট্ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে মথুরানাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( ১৮২২ সনের পুনর্মুদ্রিত সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬, ২২৪ ও ৪৮৪ )। তিনি মূলের টীকাকার ছিলেন, শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং নদীয়ারাজের আশ্রিত নবদ্বীপনিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই তিনটি মাত্র কথা তন্মধ্যে পাওয়া যায়। ১ম সংস্করণে ( ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫ ) মাত্র ৫ জন নৈয়ায়িকের নাম লিখিত হইয়াছিল—গঙ্গেশ, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (*Notices of Sans. Mss.*, I, 1871, p. 286) মথুরানাথ সম্বন্ধে যে প্রবাদ লিখিয়াছেন, তাহাই বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে ( ১ম সং, পৃ. ৫৫-৯, ২য় সং, পৃ. ১৪৯-৫২ ) অনুরূপ প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—মথুরানাথ ভবানন্দের গুরু ছিলেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজে বহুল প্রচারিত প্রবাদ। একমাত্র স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দ্বারা মথুরানাথ সম্বন্ধে প্রামাণিক কথা কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন ( ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৩-৬ )। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরা মথুরানাথ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী কচিৎ কচিৎ ॥

অর্থাৎ নব্যন্যায়ের সমস্ত আকরগ্রন্থের উপর মথুরানাথ সমীচীন টীকা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মথুরানাথ-রচিত গ্রন্থরাজি এ যাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এক দিকে প্রমাণিত হয়, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার পরিসর কত দূর বিস্তৃত ছিল এবং অপর দিকে তাঁহার বিস্ময়কর বুদ্ধিকৌশল ও লেখনীশক্তির বলে তিনি কিরূপ এক বরেণ্য আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সারস্বত ইতিহাসে যাহার তুলনা হয় কি না সন্দেহ।

**গ্রন্থাবলী**: ( ১ ) **তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য**: গঙ্গেশ-রচিত মূল তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের চারি খণ্ডের উপরই মথুরানাথ টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু "উপমান-খণ্ডে"র পঠন-পাঠন চিরকাল অপ্রচলিত বলিয়া তদুপরি মাথুরী টীকা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অন্য তিন খণ্ডের উপলভ্যমান টীকাংশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ( ১২৫০-১৩৪৩ সন ) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া মূল সহ সোসাইটি হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মথুরানাথের এই বিরাট্ টীকাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

( ক ) **প্রত্যক্ষখণ্ড**: ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে "মাথুরী" সন্নিকর্ষবাদ পর্য্যন্ত ( পৃ. ৬৩৯ ) পাওয়া যাইতেছে। অবশিষ্টাংশের মাথুরী অমুদ্রিত রহিয়াছে। প্রারম্ভে পিতৃবন্দনাশ্লোক দ্বারা তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন:—

ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ।
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা ॥

স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার ত্রিভুবনগীত জনক "শ্রীরাম তর্কালঙ্কার"কে তুলনা করিয়া মথুরানাথ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। শ্রীরামও তাঁহার সময়ে অতিপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং নব্যন্যায়ের টীকাকার ছিলেন—তাঁহার বিবরণ প্রবন্ধান্তরে ( সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১০২-৪ ) দ্রষ্টব্য। শ্রীরাম-রচিত ক্ষুদ্র একটি বাদগ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—৩।২ পত্রের শেষে পুষ্পিকা এই:—"ইতি শ্রীমত্তর্কালংকারভট্টাচার্য্য-শ্রীরামবিরচিতা যোগ্যানুপলব্ধিঃ।" এক স্থলে লীলাবতীপ্রকাশের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

( খ ) **অনুমানখণ্ড**: ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থে মাথুরী বাধপ্রকরণ পর্য্যন্ত (পৃ. ৯৮১ ) পাওয়া যায়। ঈশ্বরবাদের মাথুরী অপ্রাপ্য ও অমুদ্রিত রহিয়াছে। ইহার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পূর্ব্ববৎ, কেবল একটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে। যথা,

আন্বীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সন্তাণ্ডবৈরধ্যয়নং বিনাপি।
মদুক্তমেতৎ পরিচিন্ত্য ধীরাঃ নিঃশঙ্কমধ্যাপনমাতনুধ্বম্ ॥[২]

---

২। নবদ্বীপে মূলমাথুরীর অনুমান খণ্ডের একটি প্রতিলিপিতে আমরা মঙ্গলশ্লোক ও প্রারম্ভ বিভিন্নরূপ পাইয়াছি। যথা,

সনীরনীরদশ্যামং মঞ্জুখঞ্জনলোচনং।
বল্লবীবল্লভং বন্দে বৃন্দাবনবিহারিণম্ ।

এই টীকাংশই মথুরানাথের অতিপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার পঠন-পাঠন অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন পণ্ডিতসমাজের বহু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মাথুরীর এতদংশের স্থলে স্থলে "পত্রিকা" রচনা করিয়া বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছেন। মথুরানাথের সময়ে অনুমানখণ্ডের চর্চ্চা কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, গ্রন্থারম্ভে তাহার সুস্পষ্ট সূচনা আছে—"যদ্যপীদং বহুভির্বহুধা বহুধা চর্ব্বিতং জায়তে চ কৈশ্চিৎ সামান্যতো হেত্বাভাসান্তং তথাপি" ইত্যাদি। এই সন্দর্ভে রঘুনাথ শিরোমণির উপর কটাক্ষ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন ( R. L. Mitra, *Notices of Sans. Mss.* Vol. I, p. 286 )। তাহা নিতান্ত অমূলক; শিরোমণির সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সকলেই দীধিতি ব্যতীত মূলের উপরও টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন—মথুরানাথের পরবর্ত্তী জগদীশ-গদাধরও করিয়াছেন। তদ্দ্বারা কেহই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শিরোমণির সমকক্ষতা বা বিপক্ষতা লাভের দুরাশা পোষণ করেন নাই। এতদ্বিষয়ে নবদ্বীপে যে প্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে ( নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৭-৮ প্রভৃতি ), তাহা নিষ্প্রমাণ কল্পনা মাত্র। এই গ্রন্থের দুই স্থলে "পিতৃচরণে"র ব্যাখ্যা মথুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন ( পৃ. ১৬৩-৪ ও ২৯৪ ৫ ) এবং প্রথম স্থলে খণ্ডনও করিয়াছেন। অনুমান হয়, শ্রীরাম মূলেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন

( গ ) **শব্দখণ্ড:** ইহার প্রথমাংশ ( পৃ. ৫২৫ ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষাংশ ( পৃ. ৮৬৬ ) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জাতিশক্তিবাদ প্রকরণ হইতে ( পৃ. ৫৫৬ ) মাথুরী অপ্রাপ্য বলিয়া মুদ্রিত হয় নাই। শব্দখণ্ডের মাথুরীর আরম্ভ শ্লোকত্রয় অবিকল অনুমান-খণ্ডের ন্যায়।

এই তিন খণ্ড টীকার উপলব্ধাংশ মূল বাদ দিয়া অন্যূন ২,০০০ মুদ্রিত পৃষ্ঠাব্যাপী এবং মোট গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০, অর্থাৎ মহাভারতের এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে। বিলুপ্তাংশ ধরিয়া আরও বেশী হইবে।

( ২ ) মথুরানাথ পক্ষধর মিশ্রের "আলোক" টীকার উপরও "রহস্য" নামক উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। আলোকের পঠন-পাঠন বহু কাল হইল নবদ্বীপে এবং পক্ষধর মিশ্রের স্বকীয় সমাজ মিথিলায়ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং "মিশ্রমাথুরী"র প্রতিলিপি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। আমরা নানা স্থানে ইহার খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়াছি। তন্মধ্যে শব্দালোকমাথুরীর প্রতিলিপি অনেকটা সুপ্রাপ্য—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ( ৫২৮ সংখ্যক দর্শনের পুথি, লণ্ডনে (*I. O. Cat*,, I. p. 630. পত্রসংখ্যা ২৩৮) এবং অন্যত্র ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রারম্ভ এই :—

---

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
বিশদীকৃতা দুর্গমাংশেঽনুমানখণ্ডফক্কিকাঃ॥

প্রত্যক্ষং নিরূপিতমিদানীমনুমানং নিরূপণীয়ম্…। ইত্যাদি

লক্ষ্য করিতে হইবে, অবতরণিকার প্রচলিত পাঠে আরম্ভে যে গর্ব্বসূচক বাক্য রহিয়াছে, তাহা এই পুথিতে নাই।

কুঞ্চিতাধরপুটেন পূরয়ন্ বংশিকাং প্রচলদঙ্গুলিপঙ্‌ক্তিঃ।
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ পাতু কোপি নবনীরদচ্ছবিঃ॥
শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
শব্দমণিপরিচ্ছেদালোকো ব্যাখ্যায়তে স্ফুটম্॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে **প্রত্যক্ষালোকমাথুরীর** **দুইটি** অতিদুর্লভ খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (৩৯৯ খ-গ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৯৪+৩২ ও ২৮)। প্রথমটি অন্যথাখ্যাতি-প্রকরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার প্রারম্ভও একরূপই, কেবল শেষ পঙ্‌ক্তির পাঠ যথোচিত পরিবর্ত্তিত। যথা,—বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে "প্রত্যক্ষালোকফক্কিকাঃ।" **অনুমানালোকমাথুরীর** প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে (*I. O. Cat.*, I. p. 630.), মাত্র উত্তরখণ্ডের (উপাধিবাদ হইতে ঈশ্বরবাদ পর্য্যন্ত) পত্রসংখ্যাই ৭৩+১৫৫। সমগ্র গ্রন্থের আয়তন সহজেই অনুমেয়। সুতরাং মিশ্রমাথুরীও মূলমাথুরীর ন্যায় বিপুলায়তন বটে এবং এযাবৎ আবিষ্কৃত ইহার তিন খণ্ডের খণ্ডিতাংশ একত্র করিলেই গ্রন্থসংখ্যায় অন্যূন ৩০,০০০ হইবে। বিলুপ্তাংশ যোজনা করিলে সমগ্র টীকার পরিমাণ মহাভারতের অর্দ্ধাংশ হওয়া অসম্ভব নহে।

(৩) মথুরানাথ, শিরোমণির প্রচলিত ৮টি গ্রন্থের উপরই "রহস্য" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষদীধিতি, পদার্থখণ্ডন ও নঞ্‌বাদের মাথুরী আমরা অদ্যাপি কোথাও দেখি নাই। সমুচিত অনুসন্ধান করিলে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে **"অনুমানদীধিতিমাথুরী"র** পূর্ব্বখণ্ডের (সামান্যলক্ষণাপ্রকরণ পর্য্যন্ত) একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১০৩৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, পত্রসংখ্যা ৪৩+২৪৩, মধ্যে ১০০-১২১ পত্র নাই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পূর্ব্বখণ্ডের একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (২০৯৮ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ২৫০)। পরিষদের পুথির স্থলে স্থলে তেলুগু অক্ষরে পার্শ্বটীকা আছে। দীধিতির এই টীকা পরিমাণে জাগদীশী অপেক্ষা অনেক বড়, প্রায় দেড়া—পূর্ব্বখণ্ডের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০। মথুরানাথের এই টীকা নৈয়ায়িকসমাজে কেন প্রচারলাভ করিল না—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। ইহার প্রারম্ভে "কুঞ্চিতাধর" শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়:—

জগদ্‌গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্দ্ধ্নি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথো দীধিতিং স্ফুটয়ত্যমুম্॥

(৪) **গুণদীধিতিমাথুরীর** প্রতিলিপি অনেকটা সুপ্রাপ্য—প্রায় সমস্ত পুথিশালায়ই ইহা রক্ষিত আছে। ইহার প্রারম্ভশ্লোক অবিকল অনুমানদীধিতিমাথুরীর ন্যায়। ইহার গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ বটে। উদয়নাচার্য্যের "গুণকিরণাবলী" এবং তদুপরি বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত "প্রকাশ" নব্যন্যায়ের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে নবদ্বীপে এবং অন্যত্র খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নিবিড়ভাবে টীকা-টিপ্পনী সহযোগে অধীত হইত।

(৫) **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিমাথুরী**: ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা এক স্থলে ৬

পত্রের একটি পুথি দেখিয়াছিলাম—শেষে লিখিত আছে, "ইত্যন্তং প্রচরত্তী বৌদ্ধাধিকার-শিরোমণের্মাথুরী"। মথুরানাথ সম্পূর্ণ গ্রন্থেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

(৬) **লীলাবতীদীধিতিমাথুরী**ঃ ইহার প্রতিলিপিও একাধিক পুথিশালায় রক্ষিত আছে এবং খণ্ডিত প্রথমাংশ বহু স্থলেই সুপ্রাপ্য। আরম্ভে "কুঞ্চিতাধর" মঙ্গলশ্লোকের পর আছে :—

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশ-ধীমতা।
ভাবঃ প্রকাশ্যতে চারু লীলাবত্যাঃ শিরোমণেঃ॥

বলা বাহুল্য শ্রীবল্লভাচার্য্যের "ন্যায়লীলাবতী" প্রকরণ এবং তদুপরি বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের "প্রকাশ" নব্যন্যায়ের অবশ্যপাঠ্য আকরগ্রন্থরূপে পরিগৃহীত হইত।

(৭) **আখ্যাতবাদটীকা**ঃ শিরোমণির আখ্যাতশক্তিবাদ সুবিস্তৃত "মাথুরী" টীকা সহ সোসাইটী হইতে শব্দখণ্ডের ২য় ভাগের শেষে (পৃ. ৮৬৭-১০০৯) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) **দ্রব্যকিরণাবলীটীকা**ঃ মথুরানাথ উদয়নাচার্য্যকৃত মূল দ্রব্যকিরণাবলী গ্রন্থের বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন ("দ্রব্যস্যাশেষফক্কিকাঃ")। নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু সবই খণ্ডিত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইহার যে প্রতিলিপি আছে (১৩৯ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ১০২), তাহা পৃথিবীগ্রন্থের পর কিয়দংশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান নৈয়ায়িকগণ মুক্তিবাদাদি নানাবিধ বিষয়ে এতদ্‌গ্রন্থে মথুরানাথের অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিতেছি :—(২১।১ পত্র, অস্মদীয় পুথির ২৪।১ পত্র) অশরীরমিতি—বাব ইতি সম্বোধনে সম্বোধ্যা মৈত্রেয়ী···মণিকৃতস্ত বাবসন্তমিতি যচ্ছুকি, তথাচ শরীরযোগং বিনা পুনঃ পুনঃ সত্ত্বমিত্যর্থ ইত্যাহুঃ। তদসৎ তথা সতি বাবসতমিতি প্রয়োগঃ স্যাৎ "অভ্যস্তাদন্তিরনকার" ইতি নকারলোপাৎ তস্মাৎ কল্পতরুকার-সম্মতোক্তব্যাখ্যৈব জ্যায়সী।

*বুঝা যায়, মথুরানাথ পাণিনিব্যাকরণে অধীতী ছিলেন না—উদ্ধৃত সূত্র কলাপ-*ব্যাকরণের (চতুষ্টয়ের ১০৬ সূত্র) বটে। আর, কল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহার পড়া ছিল।

(৯) **গুণকিরণাবলীটীকা**ঃ উদয়নাচার্য্যের মূল গুণকিরণাবলীর উপরও মথুরানাথ বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নানা স্থানে পাওয়া যায়। প্রারম্ভে "কুঞ্চিতাধর" শ্লোক, তৎপর "শ্রীমতা" ইত্যাদি শ্লোক (শেষার্দ্ধ "বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে গুণগ্রন্থস্য ফক্কিকাঃ"), তৎপর "আন্বীক্ষিকী-পণ্ডিতমণ্ডলীষু" প্রভৃতি শ্লোক ও তৎপর নিম্নলিখিত গর্ব্বোক্তি :—

যদুক্তগ্রন্থং স্ববিচিন্ত্য যত্নাদ্‌ দম্পতেরপ্যনুবোধমেতৎ।
শাস্ত্রং যথা কৃষ্ণপদারবিন্দধ্যানং বিনা সোঽপি স্থিরং ন ধত্তে॥

(১০) **বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি**ঃ—অর্থাৎ উদয়নাচার্য্যকৃত "আত্মতত্ত্ববিবেক" প্রকরণের

উপরও মথুরানাথ বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন ("বৌদ্ধাধিকারবিবৃতির্বিশদীক্রিয়তে") । সোসাইটী হইতে প্রকাশিত সটীক গ্রন্থে ইহার কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে (৩৮ পৃষ্ঠার পর মাথুরী টীকা নাই), অথচ মুদ্রিত টীকা-চতুষ্টয়ের মধ্যে মাথুরীই আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

(১১) **লীলাবতীমাথুরী**ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত "ন্যায়লীলাবতী" প্রকরণের মাথুরী টীকাও খণ্ডিতাকারে বহু স্থানে পাওয়া যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৪৫৫ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য (পত্রসংখ্যা ৫৮)—প্রারম্ভে আছে—"বিবিচ্যতে চ সিদ্ধার্থো লীলাবত্যাং বিশেষতঃ।"

(১২) **দ্রব্যপ্রকাশটীকা**ঃ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত "দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশে"র মাথুরী টীকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা কতিপয় পত্র মাত্র এক স্থলে দেখিয়াছি।

(১৩) **গুণপ্রকাশবিবৃতি**ঃ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত "গুণকিরণাবলীপ্রকাশে"র মাথুরী টীকার প্রথমাংশ সুপ্রাপ্য ("গুণপ্রকাশবিবৃতিঃ ক্রিয়তে বিদুষাং মুদে")। ইহার উপলভ্যমান অংশ হইতে বুঝা যায়, ইহাও আয়তনে বিস্তীর্ণ ছিল।

(১৪) **লীলাবতীপ্রকাশটীকা**ঃ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের মাথুরী টীকার কিয়দংশও নানা স্থানে পাওয়া যায় ("লীলাবত্যাঃ প্রকাশোঽথ বিশদীক্রিয়তে ময়া")। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটী খণ্ডিতাংশ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ৩১, চৌখাম্বা সংস্করণের মাত্র ৫৩ পৃ. পর্য্যন্ত)। ইহাও বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা বটে।

**বিলুপ্ত গ্রন্থ**ঃ (১৫) **গৌতমসূত্রবৃত্তি**ঃ নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটী পুস্তকতালিকার মধ্যে আমরা (জগদীশরচিত) "গুণসূক্তি" ও "গৌতমসূত্রমাথুরী"র উল্লেখ পাইয়াছি। উভয় গ্রন্থই এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

(১৬) **সুপ্‌শক্তিবাদ**ঃ আখ্যাতবাদের টীকার দুই স্থলে (পৃ. ৯৫৩-৪) মথুরানাথ স্বরচিত "সুপ্‌শক্তিবাদ" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

**সন্দিগ্ধ গ্রন্থ**ঃ **মঞ্জরীটীকা**ঃ কাশীর সরস্বতীভবনে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণির রচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর একটী টীকাংশ আমরা দেখিয়াছি (ন্যায়বৈশেষিক, ২০২ সংখ্যক পুথি, মাত্র ৬ পত্র)। ইহার কোন মঙ্গলাচরণ নাই। পার্শ্বে সাঙ্কেতিক পরিচয়লিপি আছে "ম-টী-ম" এবং পরবর্ত্তী হস্তাক্ষরে লিখিত আছে "মথুরানাথী"। দুই স্থলে দীধিতিকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে—"ঈশ্বরাত্মনি মহত্ত্বপরিমাণস্য দীধিতিকৃদসম্মতত্বাৎ" (১ পত্র), "বিশিষ্টানুভবং প্রত্যেব বিশেষণধিয়ো হেতুত্বমিতি দীধিতিকৃতো বদন্তি" (৩।২ পত্র)। ইহা মথুরানাথ-রচিত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না।

**মহিম্নঃস্তবটীকা**ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় মহেশ ন্যায়রত্নের সংগ্রহে (৬৮৯ সংখ্যক পুথি) মহিম্নঃস্তবের খণ্ডিত একটী টীকা আছে (পত্রসংখ্যা ৬, ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যাংশ পর্য্যন্ত)। ইহাতেও কোন মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু পার্শ্বে সুস্পষ্ট পরিচয়লিপি আছে "মাথুরী"। গ্রন্থমধ্যেও নৈয়ায়িকের ভাষা পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থারম্ভ যথাঃ—

নম্বু গুণবত্বেন কীর্ত্তনং স্তোত্রং গুণেন বিমুক্তাত্মনো ভগবতো স্তুতিং কশ্চিন্ন করোতি। অতঃ স্তোতব্যাপরিজ্ঞানে স্তুতেরসম্ভবিত্বমাশঙ্ক্য পরিজিহীর্ষুরাহ—মহিম্ন ইতি।

এ স্থলেও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের নিকট পৃথক্ আর একটি ক্ষুদ্রতর মহিম্নঃ-স্তবটীকা আছে, পত্রসংখ্যা ১০, কিন্তু প্রথম ২ পত্র নাই। পার্শ্বে সুস্পষ্ট পরিচয়লিপি আছে "মহিম্নঃ মাথুরী" এবং শেষে পুষ্পিকা আছে "ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমথুরানাথতর্কবাগীশকৃতা মহিম্নঃস্তবকৌমুদী সমাপ্তা"॥ (লিপিকাল ১৭৩৪ শক)। এই টীকা প্রাঞ্জল হইলেও মহানৈয়ায়িক মথুরানাথের লিপিকৌশলবর্জিত এবং নিশ্চিতই অপর কোন মথুরানাথ-রচিত।

**পাণিগ্রহণাদিবিবেক**:—রাজেন্দ্রলাল মিত্র মথুরানাথ-রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপির সন্ধান পাইয়াছিলেন (L. 3164, পত্রসংখ্যা ২১)। প্রারম্ভে অবিকল "কুঞ্চিতাধর" শ্লোক ও তৎপর "শ্রীমতা" প্রভৃতি শ্লোক (শেষার্দ্ধ:— "*পাণিগ্রহাদিকৃত্যানাং বিবেকঃ ক্রিয়তে ময়া*") দেখিয়া ইহা নৈয়ায়িক মথুরানাথের রচনা বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতায় সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থেরই একটি সুবৃহৎ প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২১২, মধ্যে ৭-২৩ পত্র নাই)। ইহাতে বহু গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম তুলিয়া দিতেছি:— নারায়ণোপাধ্যায় (৪।১ পত্র), নির্ণয়কার (২৬।২—নির্ণয়কৃতস্তু মকরস্থো যদা জীবঃ...), খনা (৩১।২, ৪২।২, ১৬১।১), জ্যোতিঃশিরোমণি (৫৪।১), জ্যোতিঃকৌমুদ্যাং ন্যায়মুকুটঃ (৬৬।১, ১৭৬ ২), সৌভরি (৬৭।১), দীপিকাটীকা (রাঘবাচার্য্যকৃত ১০৩।২, ১৬৬-৭), জ্যোতিস্তত্ত্ব (১০৩।২, ১০৫।১), স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য (১১১।১), জ্যোতীরত্ন (১১৩), বাস্তুনির্ণয়ে রত্নমালায়াং (১২০।২), শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়ামাচার্য্যচূড়ামণ্যাদেঃ (১৪৭।২)।

রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব ১৪৮৯ শকাব্দের (১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) পরে রচিত। ঐ সময়ে নিঃসন্দেহ মথুরানাথ জীবিত ছিলেন। নৈয়ায়িকপ্রবর সমকালীন স্মার্ত্তের নাম সসম্মানে উল্লেখ করিবেন, মনে হয় না। আর, নির্ণয়কার যদি গোপাল ন্যায়পঞ্চানন হন, তবে নিশ্চিতই এই মথুরানাথ পৃথক্ ব্যক্তি। গোপাল নৈয়ায়িক মথুরানাথের পরবর্ত্তী—১৫৩৫ শকাব্দে (১৬১৩ খ্রী.) তিনি "অশৌচনির্ণয়" রচনা করেন (L. 3188. "শাকে শরৈর্বহ্নি-শরেন্দুমানে")। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালার স্মার্ত্তপণ্ডিতসমাজে মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামে একজন স্মৃতিগ্রন্থকারের নাম প্রচারিত ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার "প্রায়শ্চিত্তসারসংগ্রহ" গ্রন্থে তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৭৭৪ শকের সংস্করণ, পৃ. ২৮)।

স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "আয়ুর্দ্দায়ভাবনা" নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ নৈয়ায়িক মথুরানাথরচিত বলিয়া ধরিয়াছেন (*J. A. S. B.*, 1915, p. 278)। কিন্তু তাহা বোধ হয় পৃথক্ ব্যক্তির রচনা, যদিও প্রারম্ভশ্লোক হইতে তাহা বুঝা কঠিন (L. 2241, পত্রসংখ্যা ১২):—

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে আযুর্দ্দায়স্য ভাবনাঃ॥

**মৌলিক গ্রন্থ ঃ** পরিশেষে আমরা মথুরানাথের বিরাট্ মৌলিক গ্রন্থ **সিদ্ধান্তরহস্যের** সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী সমাপ্ত করিতেছি। তাঁহার বহু টীকাগ্রন্থমধ্যে স্বরচিত সিদ্ধান্তরহস্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (অনুমানখণ্ড, পৃ. ৯৮, ১২৯, ২৭১, ২৮৪: দ্রব্যকিরণাবলীরহস্য ৪।১, ৬৭।২ পত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) এবং বুঝা যায়, মথুরানাথ স্বয়ং তাঁহার ঐ বিচারমূলক বিপুল গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। নবদ্বীপের দুই জন প্রধান নৈয়ায়িক "সিদ্ধান্তরহস্য" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও মথুরানাথ। পদার্থখণ্ডনের টীকায় রামভদ্র এক স্থলে স্বরচিত ঐ গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (কাশীর সং. পৃ. ৯৬-৭, অস্মদীয় পুথির ৭।২ পত্র)। কিন্তু রামভদ্রী সিদ্ধান্তরহস্য অদ্যাপি কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। নবদ্বীপে জগদীশ-বংশধর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহে একটি পুস্তকসূচির মধ্যে "সিদ্ধান্তরহস্য মাথুরী"র উল্লেখ দেখিয়াছি এবং আদ্যন্তরহিত নামহীন একটি গ্রন্থও দেখিয়াছি, যাহা মাথুরী সিদ্ধান্তরহস্য বলিয়া আমাদের অনুমান হয়—মূর্ত্তত্বজাতিনিরাকরণং (১২৪।১ পত্র), দ্রব্যত্বজাতিপ্রমাণং (১৩০।১), গুণত্বজাতিখণ্ডনং (১৩১।১) প্রভৃতি প্রকরণ এবং "ভট্টাচার্য্যাদিসকলপ্রামাণিকসিদ্ধত্বাৎ" (১২২।২) প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ সূচনা করে। কোলব্রুক্ সাহেব মনোহর বঙ্গাক্ষরে লিখিত অজ্ঞাতকর্ত্তৃনাম "সিদ্ধান্তরহস্য" গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পত্রসংখ্যা ৩৪৫ এবং প্রকরণসংখ্যা অন্যূন ৬০ (অধুনা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত :—*I O. Cat.* I, pp. 644-5, No. 660)। ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মাথুরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে মনে হয়। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাগরাক্ষরে লিখিত একটি "সিদ্ধান্তরহস্য" আছে, পত্রসংখ্যা ২-৩৬২। শেষ প্রকরণ "পাকজবিচাররহস্যং"। সৌভাগ্যবশতঃ ইহাই মাথুরী বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ হয়; কারণ, মধ্যে এক স্থলে (১৮৮।২) প্রারম্ভাংশ পাওয়া যাইতেছে। প্রথম শ্লোক "কুঞ্চিতাধর" প্রভৃতি। তৎপর,

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা।
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সিদ্ধান্তানাং প্রচক্ষ্যতে॥
আন্বীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সন্তাণ্ডবৈরধ্যয়নং বিনাপি।
মদীয়সিদ্ধান্তরহস্যমেতদ্বিলোক্য ধীরাঃ সকলান্ জয়েয়ুঃ॥
বুধবরনিকরাগ্রে জ্ঞাপনেঽধ্যাপনে বা
বিশ (?) ইতরনিবন্ধং তর্কবন্ধং মদীয়ং।
সততমনবলোক্য প্রায়শো বাগধীশো
ভবতি ভুবনমধ্যে বাবদূকোপি মূকঃ॥

এই প্রতিলিপি অনেকটা বিপর্য্যস্ত হইয়া আছে। অনেক প্রকরণের শেষে সংখ্যানির্দ্দেশ আছে—চিত্ররূপস্পর্শখণ্ডনং। ৬৬ (৩০৮।২ পত্র) প্রভৃতি। মোট প্রকরণের সংখ্যা ৭৫

হইতে বেশী। কাশী, চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "বাদবারিধি" গ্রন্থের ২য় খণ্ডে একটি অজ্ঞাতকর্তৃনাম "নিত্যসুখবাদ" মুদ্রিত হইয়াছে ( পৃ. ১৪৮ দ্রষ্টব্য )। ইহা বস্তুতঃ মাথুরী সিদ্ধান্তরহস্যের ৭৫ সংখ্যক প্রকরণ "ঈশ্বরে নিত্যসুখব্যবস্থাপনং" ( ৩৩৭।২-৩৪১।২ পত্র )। ইহার শেষে অতি দুর্লভ এক নৈয়ায়িকপ্রবরের সন্দর্ভ মথুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন ( বাদবারিধি, পৃ. ১৪৮, পুথির ৩৪১।২ পত্র—"পরে তু···ইত্যাহুঃ" ); উদ্ধৃত সন্দর্ভের শেষে অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক স্বরচিত একটি টীকার নামোল্লেখ করিয়াছেন—"অধিকং শব্দমণ্যালোকবিস্তারে বিবেচয়িষ্যামঃ"। বর্ত্তমানে এই টীকাগ্রন্থ ও তাহার রচয়িতার নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকরণে মথুরানাথ নিত্যসুখবাদী রঘুনাথ শিরোমণির নাম করেন নাই; যাঁহার সন্দর্ভ সাদরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন নৈয়ায়িক তর্কশাস্ত্রের বাদমালা পৃথক্ গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বিচার করিয়া গিয়াছেন। শিরোমণির "পদার্থখণ্ডন" এ বিষয়ে একটি পথিপ্রদর্শক। গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে এবং ফলে অন্যান্য প্রাচীনতর ও সমকালীন তাদৃশ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কণাদের "তর্কবাদার্থমঞ্জরী," রামভদ্র ও মথুরানাথের "সিদ্ধান্তরহস্য," জগদীশের "বিচার"সমূহ এবং ন্যায়বাগীশের "বাদতত্ত্ব" প্রভৃতি এই ভাবে ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে হরিরামের রচনাও অনেক স্থলে গদাধরের বাদগ্রন্থের প্রসিদ্ধি-হেতু বিরলপ্রচার হইয়াছে।

মথুরানাথের অসামান্য লেখনীশক্তি অভিজ্ঞ কারিকাকার "সর্ব্বত্র মথুরানাথী" পদে ব্যক্ত করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের উৎপত্তি উদয়নাচার্য্য হইতে এবং প্রথম পরিণতি গঙ্গেশের মণিগ্রন্থে। একমাত্র মণি, মণ্যালোক ও মণিদীধিতির সমগ্র মাথুরীই একযোগে লক্ষ গ্রন্থের অনেক উপরে যাইবে। অনুমান হয়, মথুরানাথের যাবতীয় গ্রন্থের পরিমাণসমষ্টি প্রায় ৩-৪ লক্ষ শ্লোক হইবে। আমরা দেখিয়াছি, একজন দক্ষ লিপিকার ( অক্ষয়রাম শর্ম্মা ) ছয় বৎসরে ( ১৭১২-১৭ শকাব্দে ) সমগ্র মহাভারত ( হরিবংশ বাদ দিয়া ) নকল করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের সরল রচনার স্থলে সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ দুরূহ মাথুরী গ্রন্থমালা নকল করিতে একজন লেখকের প্রায় ২০-২৫ বৎসর লাগিবে অর্থাৎ এক জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশই অতিক্রান্ত হইবে। মথুরানাথের প্রত্যেক রচনায় বহুতর পূর্ব্বতন গ্রন্থকারের মতবাদ ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহার সম্যক্ আলোচনার দ্বারা মথুরানাথের পাণ্ডিত্যের পরিসর ও গভীরতা নির্ণয় করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা একজন গবেষকের পক্ষে অসম্ভব। নব্য ন্যায়ের প্রসার জগতের সারস্বত ইতিহাসের এক অতুলনীয় অধ্যায় এবং তদ্বিষয়ক বিরাট্ সাহিত্যে মথুরানাথের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থরাজির আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সন্দেহ নাই।

**মথুরানাথ সম্বন্ধে অমূলক প্রবাদ**

মথুরানাথ (ও তৎপিতা শ্রীরাম) রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজের চিরন্তন প্রবাদ এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ নানা গ্রন্থে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া এই প্রবাদ এত দূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধে (*Sarsvati Bhavana Studies* Vol. V, p. 135) তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরিয়াছেন। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব সর্ব্বপ্রথম এক স্থলে (*The Hindoos*, 1822 ed., Vol. II, p. 6 *fn.*) শিরোমণির অন্যতম ছাত্র বলিয়া মথুরানাথের উল্লেখ করেন ('*one of Shiromunee's scholars*')—এই তথ্য তিনি তৎকালীন পণ্ডিতসমাজের নিকট জানিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। শব্দকল্পদ্রুমে ("ন্যায়" শব্দ দ্রষ্টব্য) নব্যন্যায়ের গুরুপরম্পরাস্থলে তাহাই লিখিত হইয়াছে। নবদ্বীপনিবাসী কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রাচীনদের মুখে অবগত হইয়া যে সকল স্থানীয় প্রবাদ সুলিখিত "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা স্বভাবতই প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হয়। মথুরানাথ সম্বন্ধে প্রবাদ এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (১ম সং, পৃ. ৬৫-৬৯; ২য় সং, পৃ. ১৪৯-৫২)। শিরোমণির ছাত্রতা-ঘটিত প্রবাদই মনোহর কাহিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিচারশীল প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসম্প্রদায় লোকপ্রবাদের ভক্ত হইয়া মূল গ্রন্থোক্ত অকাট্য প্রমাণও উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত না হইয়াও অপূর্ব্ব গবেষণাশক্তি দেখাইয়া সর্ব্বপ্রথম মথুরানাথ সম্বন্ধে চিরন্তন প্রবাদের উপর সন্দেহ পোষণ করেন (*J. A. S. B.*, 1915, p. 278)। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মাত্র মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কষ্টসাধ্য গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মথুরানাথ রঘুনাথ শিরোমণির নিকট পড়েন নাই এবং তাঁহার পিতা "শ্রীরাম তর্কালঙ্কারও শিরোমণির ছাত্র নহেন" (ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা পৃ. ২৩-৬)। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পরিপোষক অতিরিক্ত প্রমাণাবলী আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। (১) মথুরানাথ "দীধিতিকার" ও "ভট্টাচার্য্য" পদোল্লেখেই শিরোমণির মত ও সন্দর্ভ বহুতর স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি ঘুণাক্ষরেও সূচনা করেন নাই যে, দীধিতিকার তাঁহার সাক্ষাৎ অধ্যাপক ছিলেন।

(২) কতিপয় বিরল স্থলে মথুরানাথ "গুরুচরণাঃ" বলিয়া স্বকীয় অধ্যাপকের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, মূল মাথুরীর অনুমানখণ্ডের উপাধিবাদে (সোসাইটি সং, পৃ. ৩৪৮) এবং শব্দখণ্ডের বিধিবাদে (ঐ, পৃ. ১২, ৩৪, ৫৮, ৬৭ ও ১০৪)। এই সকল স্থলে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই গুরুচরণ শিরোমণি নহেন।

(৩) অনুমানদীধিতির মাথুরী স্বল্পমাত্র আলোচনা করিলেই পরিগ্রহ করা যায় যে, মথুরানাথের পূর্ব্বেই শিরোমণির উপর বহুতর টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দীধিতির পাঠনির্ণয়ে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রকরণে বহু পাঠান্তর উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে এবং বহু পাঠ "প্রামাদিক"

বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে ( পরিষদের পুথির ৫৫।২, ১৩৩।১, ১৬২।২, ১৭০।১ ও ১৯৩।১ পত্র দ্রষ্টব্য )। পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারদের মধ্যে "প্রাঞ্চ:" ( ঐ, ১২৪।১, ১৩৮।২, ১৫৬।১, ১৬২।১, ১৬৩।১ ) ও "নব্যাস্ত্ব" ( ১২৫।১, ১৬৮।২ ) পদ প্রয়োগ দ্বারা কালঘটিত পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় শিরোমণির সহিত মথুরানাথের কালব্যবধান গুরুশিষ্য-সম্পর্কের একান্ত অসম্ভবতাই প্রমাণিত করে। বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণের এক স্থলে পাঠভেদ ও পূর্ব্বতন একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাবচন খণ্ডিত হইয়াছে (১৬৬।১-১৬৭।১ পত্র)। যথা, "সাম্প্রদায়িকাস্তু পূর্ব্বং উপাধ্যনু-প্রবেশেনেতি যাবদিত্যেবাবহমানঃ পাঠঃ···ইত্যাহুঃ, তদসৎ"। এখানে 'সম্প্রদায়' বলিতে স্বভাবতঃ গ্রন্থকার শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্যপরম্পরাই বুঝায় এবং মথুরানাথের ভাষা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র হওয়া সুতরাংই একান্তভাবে অসম্ভব। পরবর্ত্তী অতএব-চতুষ্টয় প্রকরণের এক স্থলে পর পর পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাচতুষ্টয় উদ্ধৃত ও দুই স্থলে খণ্ডিত হইয়াছে ( ১৬৮।২-১৬৯।২ পত্র )। *প্রথম ব্যাখ্যাই হইল "ইতি সম্প্রদায়ঃ" এবং "তদসৎ"* বলিয়া তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

নবদ্বীপের পণ্ডিতসম্প্রদায়মধ্যে আর একটি প্রবাদ দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে যে, মথুরানাথের ছাত্র ছিলেন ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ইহাও নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হয়। উভয়ের অনুমানদীধিতিটীকা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ভবানন্দ মথুরানাথের গ্রন্থ দেখেন নাই। বরং মথুরানাথ দুই এক স্থলে ভবানন্দের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্গতিপ্রকরণের এক স্থলে মথুরানাথের বচনবিশেষ—যত্তু প্রত্যাসত্তিঃ অনুমিত্যাত্মকফলসামানাধিকরণ্যরূপেতি তদসৎ ( মাথুরীর অনুমিতিগ্রন্থ, পরিষদের পুথি, ৫।১ পত্র)—তাহাই সূচনা করে ( ভবানন্দী, সোসাইটি সং, পৃ. ১০ দ্রষ্টব্য )। এতদ্দ্বারা আমাদের পূর্ব্বানুমানই সমর্থিত হয় যে, মথুরানাথ ভবানন্দের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন ( সা-স-প, ৫০, পৃ. ১০৩ )।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ( ১২৭৩-১৩৪৭ সন ) অধুনালুপ্ত "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকায় "ন্যায়দর্শন" নামে ধারাবাহিক কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন। ১২৯৮ সনের চৈত্র-সংখ্যায় ( পৃ. ২৪৩ ) তিনি মথুরানাথ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবাদ লিপিবদ্ধ করেন—তিনি "সম্ভবতঃ" শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্র কণাদের অনুরোধে অবয়বের টীকা করেন নাই !! তখনও মাথুরীর অনুমানখণ্ড মুদ্রিত হয় নাই। মথুরানাথ অবয়বের টীকা ঠিকই করিয়াছিলেন এবং অবয়বের টীকাকার কণাদ তর্কবাগীশ মথুরানাথের ছাত্র হওয়া দূরের কথা, প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে তিনি স্বয়ং শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন ( সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭০), যদিও তিনি পরে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণির ছাত্র ছিলেন। গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্তিকালে এইরূপ কল্পিত উপাখ্যান সহজেই প্রচারিত হইয়া পড়িত। তর্করত্ন মহাশয় এ স্থলে আর একটি অশ্রুতপূর্ব্ব প্রবাদ লিখিয়াছেন যে, মথুরানাথের নিবাস ছিল "কোটালিপাড়, জেলা ফরিদপুর"। দুঃখের বিষয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নাই।

মথুরানাথ নাম, তর্কবাগীশ উপাধি এবং নব্যন্যায়ের চর্চা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এত সুলভ ছিল যে, এই ত্রিতয়ের এক ব্যক্তিতে সংযোগ বহু পণ্ডিতসমাজে সংঘটিত হইয়া নদীয়ার মুকুটমণিকে স্থানচ্যুত করার দুরাশা অর্ব্বাচীন হৃদয়ে উত্থাপিত করিতে পারে।

**মথুরানাথের গুরু :** অনুমানদীধিতির পূর্ব্বখণ্ডের টীকায় দুই স্থলে মথুরানাথ "ইত্যস্মদ্‌গুরুচরণাঃ" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমটি ব্যাপ্তিবাদে সিদ্ধান্তলক্ষণ-প্রকরণে সার্ব্বভৌমমতখণ্ডনস্থলে (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭১ উদ্ধৃত ; তর্কবাগীশের ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা পৃ. ২৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য—পরিষদের পুথিতে এই স্থল ত্রুটিত)। দ্বিতীয়টি বিশেষ-ব্যাপ্তিপ্রকরণে—বস্তুতঃ প্রত্যক্ষমণৌ সংযোগিভেদস্যাপি অব্যাপ্যবৃত্তিত্বোপগমাৎ……… অভেদস্যেত্যাদিমূলস্যাপি কপিসংযোগিভেদপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নাভেদস্যেত্যর্থকত্বাদিত্যস্মদ্‌গুরু-চরণাঃ ( পরিষদের পুথি, ১৪৪।২—১৪৫।১ পত্র )। এই দুই স্থলেই সুবিখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কারও সন্দর্ভ দুইটি অবিকল "ইত্যস্মদ্‌গুরুচরণাঃ" বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে একই ন্যায়গুরুর অর্থাৎ রামভদ্র সার্ব্বভৌমের শিষ্য হইতেছেন। এই মূল্যবান্‌ তথ্য আবিষ্কারের ফলে বহু সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার এক সার্ব্বভৌমের শিষ্য ছিলেন ; এই সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্বে আমরা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম ( সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৩ )। কিন্তু তিনি রামভদ্র সার্ব্বভৌম হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা—পিতা-পুত্রের এক গুরুর শিষ্য হওয়ার প্রবাদ তদ্দ্বারা অংশতঃ সমর্থিত হয়। শ্রীরাম রামভদ্রের (অভ্যুদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রীঃ) প্রথম সময়ের ছাত্র হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। অধিকন্তু, মথুরানাথ দীধিতির "সম্প্রদায়ে"র সহিত নিজ সম্প্রদায়ের পার্থক্য সূচনা করিয়া যে বচনাদি খণ্ডনার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই নূতন আলোকপাতে তাহা সঙ্গত হয়। কারণ, রামভদ্রের পিতা ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি "নব্যাস্তু" পদোল্লেখে শিরোমণির এক বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রামভদ্র পদার্থখণ্ডনের টীকায় পিতৃমতই সমর্থন করিয়াছেন ( সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭০ )। রামভদ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব পঞ্চাননও "আত্মতত্ত্বপ্রবোধ" গ্রন্থে শিরোমণির ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। যথা, "স্বাধিকরণসময়-প্রাগভাবাধিকরণক্ষণানুৎপত্তিকত্বং তথা সতি কাদাচিৎকত্বং বা ক্ষণিকত্বমিতি চ বৌদ্ধাধিকারব্যাখ্যানে নব্যোক্তং ন যুক্তং…" (অস্মদীয় পুঁথির ১-২ পত্র)। এ স্থলেও "নব্য" পদে শিরোমণিকে বুঝাইতেছে ( আত্মতত্ত্ববিবেক, সোসাইটির সং, পৃ. ২৫ দ্রষ্টব্য )। ফলকথা, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ন্যায় চূড়ামণিও নব্যন্যায়ে পৃথক্‌ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিরোমণির অপূর্ব্ব সাফল্যে সকলের চেষ্টাই বিফল হইয়া যায় এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বাধ্য হইয়া শিরোমণির গ্রন্থ-সমূহের টীকা রচনা করিয়াই প্রতিভা প্রকাশ করেন। রামভদ্রের ছাত্র মথুরানাথ দীধিতির অনেক প্রচলিত পাঠ প্রামাদিক বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা একটি স্থল পূর্ব্বতন প্রবন্ধে ( সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৩ ) উদ্ধৃত করিয়াছি। লক্ষ্য করিতে হইবে, পাঠান্তরটি মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যকল্পিত বলিয়া লেখা পাওয়া গিয়াছে। এই পাঠান্তর

প্রাচীনতর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম মোটেই উল্লেখ করেন নাই এবং একমাত্র মথুরানাথই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। মথুরানাথের বৈশিষ্ট্য আর একটি স্থলেও লক্ষণীয়। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণে চতুর্দ্দশলক্ষণী মধ্যে যেটি প্রগল্‌ভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া অন্যত্র সমস্ত টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, মথুরানাথ একাকী তাহা "বিশারদ"-লক্ষণ বলিয়াছেন (পরিষদের পুথি, ৪৩।১ পত্র)। আমাদের অনুমান, মথুরানাথের এই বৈলক্ষণ্যই তাঁহার "দীধিতিরহস্য" সম্যক্ প্রচারিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে, পরমগুরু চূড়ামণির (ন্যায়সিদ্ধান্ত-) মঞ্জরী গ্রন্থের উপর টীকা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয়।

**মথুরানাথের অভ্যুদয়কাল :** মথুরানাথের কালনির্ণয় এখন সহজসাধ্য। তিনি তাঁহার সতীর্থ জগদীশ তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। জগদীশ স্থানে স্থানে মথুরানাথের বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, অবশ্য নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা দুইটি স্থল উদাহরণস্বরূপ দেখাইতেছি। ব্যাপ্তিবাদ সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে এক স্থলে জগদীশ লিখিয়াছেন :—"যত্তু 'দ্রব্যে ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণোঃ সাধ্যতাভ্রমং নিরসিতুমিদমিতি পক্ষনির্দ্দেশ' ইতি, তন্মন্দম্" (চৌখাম্বা সং, পৃ. ২১৩)। ইহা মাথুরীরই ব্যাখ্যা-বচন বটে (পরিষদের পুথি, ৯৮-৯ পত্র—তত্রত্য পাঠ 'ভ্রমনিরাসায়'), কৃষ্ণদাস কিম্বা ভবানন্দের নহে। সামান্যলক্ষণাপ্রকরণে শিরোমণির সুপ্রসিদ্ধ অন্ধকারলক্ষণ ('অন্ধকারস্তু তেজোবিশেষ-সামান্যাভাবঃ' ইত্যাদি) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জগদীশ লিখিয়াছেন—"উদ্ভূতানভিভূতরূপ-বন্মহাতেজঃসামান্যাভাবস্ত নার্থঃ..." (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৪৬০)। ইহাও মাথুরীর বচন (২২০।২ পত্র—মহদুদ্ভূতানভিভূতরূপবত্তেজসঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসামান্যাভাব ইত্যর্থঃ), ভবানন্দাদির নহে। সুতরাং ধরা যায়, মথুরানাথ জগদীশের প্রায় এক যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা প্রায় ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। কারণ, জাগদীশীর ১৫৩২ শকাব্দের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৫১) এইরূপ কাল-নির্দ্দেশ এক্ষণে প্রমাণসিদ্ধ হয়। মথুরানাথের অভ্যুদয়কালের ঊর্দ্ধতন সীমা হইবে প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ইহা অনুমান করা চলে যে, এই অভ্যুদয়কালের প্রথমাংশে তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহা বোধ হয় কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমরা গুণানন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৭০-১) নবদ্বীপের একটি অতীব মূল্যবান্ প্রাচীন বিক্রয়-পত্র "উষা" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এই বিক্রয়পত্র ১৪৯০ শকে (অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) "শ্রীরামতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যাণাং সদসি" সম্পাদিত হইয়াছিল। আমরা তৎকালে তাঁহাকে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। ভবানন্দের পৌত্র (উক্ত রাম তর্কালঙ্কারের পুত্র) রুদ্রদেব তর্কবাগীশ গদাধরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও খণ্ডনকারী ছিলেন এবং প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন (সা-প-প, ৫৫, পৃ. ৬১-৪)। সুতরাং

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৮২ বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতার সমৃদ্ধিকাল কিছুতেই ঘটে না। বিশেষতঃ তৎকালে স্বয়ং ভবানন্দই নবদ্বীপের "মহাধ্যাপক"-রূপে জীবিত ছিলেন (ঐ, পৃ. ৫৭-৮) সন্দেহ নাই। অতএব এখন নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, বিক্রয়-পত্রোক্ত মহাপণ্ডিত মথুরানাথের পিতা "জগদ্‌গুরু" শ্রীরাম হইতে অভিন্ন। সাধারণতঃ এ-জাতীয় বিক্রয়পত্রাদি স্থানীয় সমৃদ্ধ ও প্রধান ব্যক্তির গৃহে সমবেত বহু জনসমক্ষে সম্পাদিত হইত। এ স্থলে পত্রটিতে ২১ জন সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে এবং "সদসি" পদ দ্বারা ভট্টাচার্য্যের মহাসমৃদ্ধি সূচিত হইয়াছে। সুতরাং এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ লেখ্য হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ সনে শ্রীরাম সমৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মথুরানাথের তখন পূর্ণ যৌবন।

**মথুরানাথের বংশপরিচয়ঃ**—নবদ্বীপের বৃদ্ধপরম্পরা একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, নব্যন্যায়ের তিন জন মহারথী মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর যথাক্রমে রাঢ়ীয়, বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে মথুরানাথের বংশ চিরলুপ্ত বলিয়া (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯) তাঁহাদের কুলপরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে।[৩] কিছু কাল পূর্ব্বেও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৪)। সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি একটি কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের নাম আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কুলপঞ্জীর পঙ্‌ক্তিটি যথাযথ বিবৃতি সহকারে উদ্ধৃত হইল।

"কাঁটাদিয়া" বন্দ্যঘটীবংশের "ভরত" একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী"গ্রন্থে ৭৬ সমাকরণে তাঁহার সম্বন্ধে কারিকা দৃষ্ট হয় (নগেন বসুর সং, পৃ. ৯৩-৪)। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ "শ্রীনাথ"। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রাম ও ব্যাস ৯১ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (ঐ, পৃ. ১১৭)। শ্রীনাথ "বিদ্যাধরী" মেলের কুলীন ছিলেন, তাঁহার বংশধারা ও বিস্তৃত কুলবিবরণ নানা কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার ৯ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "যদুনন্দন" (অথবা পাঠান্তর "যদুনাথ"), তৎপুত্র "গোবিন্দরাম" যশোহর, হোগলানিবাসী জমীদার কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ১২৫।২ পত্র)। গোবিন্দরামের পুত্র "রঘুনাথ" বল্লালী আদি কুলীন মকরন্দের অধস্তন "দ্বাদশ" পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ খ্রী. ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রায় ১৬০০ সনে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কুলবিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল:—(ঐ, ঐ)

---

৩। গত বৎসর আমরা নবদ্বীপের একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম, নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ৺যাদুভট্ট অর্থাৎ রায় সাহেব রামযাদু ভট্টাচার্য্যই মথুরানাথের বংশধর ছিলেন। বস্তুতঃ যাদুভট্টের আদিপুরুষ মথুরানাথ বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থকার পূর্ব্বস্থলীনিবাসী মথুরানাথ বিদ্যালঙ্কার—ইঁহারা ঋগ্বেদী উতথ্যগোত্র, পাশ্চাত্য বৈদিক। খ্রী. ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান এই মথুরানাথের বহু প্রামাণিক বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, তিনি নৈয়ায়িক মথুরানাথ নহেন।

অস্য বিবাহ চং শঙ্কর হালদারস্য কন্যা, **পশ্চাৎ মুং গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীকস্য কন্যাবিবাহ নুদিয়াবাসী শ্রীরামতর্কালঙ্কারজঃ।**

এই উক্তি হইতে কতিপয় নূতন কথা জানা যাইতেছে। পারিবারিক বিবরণের আলোচনাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, নবদ্বীপনিবাসী এই শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ( ১৫০০-৫০ খ্রী. ) জীবিত ছিলেন, তিনি ভরদ্বাজগোত্র "মুখোপাধ্যায়"বংশীয় ছিলেন এবং ভঙ্গকুলীনে পৌত্রী বিবাহ দেওয়ায় বুঝা যায় সমৃদ্ধিশালী "বংশজ" ছিলেন। নবদ্বীপে একই সময়ে দুই জন স্বনামধন্য শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, ইনিই মথুরানাথেব পিতা। মথুরানাথের এক ভ্রাতার নাম পাওয়া যাইতেছে "গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী," তিনিও নিঃসন্দেহ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। কারণ, তৎকালে বহু স্থলে "ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী" উপাধিই সংক্ষেপে "চক্রবর্ত্তী" বলিয়া খ্যাত ও লিখিত হইত—অনুমানদীধিতির ব্যধিকরণগ্রন্থে "চক্রবর্ত্তিলক্ষণ" ইহার একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। মথুরানাথ ও তাঁহার ভ্রাতার অধস্তন বংশধারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কালে যদি কোন কষ্টসহিষ্ণু গবেষক কুলপঞ্জীর নিবিড় অরণ্যে তাহা অবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হন।

**উপসংহার:** মথুরানাথের কোন ছাত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার মঙ্গলাচরণশ্লোকে বৃন্দাবনবিহারীর বন্দনা দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমত অনুমান করা চলে না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ত মহিম্নঃস্তবেরও টীকা করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ কথা এবং ইহার অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে যে, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যগণ আবহমান কাল মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় মীমাংসায় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মথুরানাথের কোন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক—সোসাইটি মুদ্রিত "মূলমাথরী" অনেক স্থলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত হয় নাই। সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনা ও মুদ্রণ বিষয়ে বাঙ্গালাদেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

---

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
# ষট্‌পঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৬শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৭শ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পরিষদের ৫৬শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পর্য্যালোচিত হইতেছে।

**বান্ধব ঃ** বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন,—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

**সদস্য ঃ** ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা,—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও ৫। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য :—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। শ্রীপ্রশান্ত-কুমার সিংহ, ১৬। মহারাজ কুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাও রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং ২১। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

অধ্যাপক-সদস্য :—বর্ষশেষে ৬ জন।

সহায়ক-সদস্য :—বর্ষশেষে ১১ জন।

সাধারণ-সদস্য :—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণসদস্যের সংখ্যা ৮৩২ জন।

**পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ ঃ** উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র মিত্র, ডি. আর ভাণ্ডারকর, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজসুন্দর রায়, মেঘেন্দ্রলাল রায়, রসময় খাস্তা, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হরিদাস ঘোষাল।

**পরলোকগত সদস্য ঃ** (ক) আজীবন-সদস্য :—নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। (খ) অধ্যাপক-সদস্য :—ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ। (গ) সহায়ক-সদস্য :—অনঙ্গমোহন সাহা। (ঘ) সাধারণ-সদস্য :—উপেন্দ্রমোহন রায়, কানাইলাল মণ্ডল, কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী, চারুচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, শৈলেশ্বর সিংহ রায় ও পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

**অধিবেশন ঃ** আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল,—(ক) পঞ্চপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৬ই পৌষ ১৩৫৬, (খ) প্রথম মাসিক অধিবেশন, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, (গ) সাগরদাঁড়ীর নিকটস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা, ১৪ই

আষাঢ়, (ঘ) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২০এ শ্রাবণ, (ঙ) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ১৬ই ভাদ্র, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ২০এ আশ্বিন।

**কার্য্যালয়ঃ সভাপতি**—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। **সহকারী সভাপতি**—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীসজনীকান্ত দাস। **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ। **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীগণপতি সরকার। **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

**কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিঃ** নিয়োক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্য-পক্ষে—১। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২। ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ৭। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৮। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৯। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১১। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৫। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৬। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১৯। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২০। শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য। (খ) শাখা-পরিষৎ পক্ষে—২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী, ২৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা—(ক) ভুবনমোহিনী দাসী সুবর্ণপদক-সমিতি—শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, (খ) সরোজিনী বসু পদক-সমিতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা-সমিতি—শ্রীসুশীলকুমার দে।

২। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৭শ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসায় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

৩। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ১৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ তারিখের অধিবেশনে স্থির হয়:—"মাসিক অধিবেশনে যথারীতি প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত না হইলে কেহই পরিষদের স্থায়ী সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন না। তবে সম্পাদকের সম্মতিতে, মাসিক অধিবেশনে যথারীতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই চাঁদা দিয়া অস্থায়ী ভাবে গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

৪। মাইকেল মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধিস্থলে স্মৃতিচিহ্নগুলি পরিষৎ

যথাযোগ্য সংরক্ষণ বা সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে না পারায়, মাইকেল-পৌত্র মিঃ এন. সি. ডাটন উহা নিজ ব্যয়ে সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে চাহিলে পরিষৎ সেই ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করেন।

৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে:—শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (আহ্বানকারী।)

৬। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কয়েকটি স্থানের বানান বিষয়ে পরিষদের মতামত চাহিলে, প্রস্তাবিত সকল বানানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটির বানানে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন:—(১) Barrackpur (২) Palashi ও (৩) Banagram.

৭। পূর্ব্বপ্রচলিত ছুটির তালিকা বাতিল করিয়া অতঃপর বর্ষমধ্যে এই উনত্রিশ দিন কার্য্যালয় বন্ধ রাখা স্থির হইয়াছে:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাংলা নববর্ষ— | ১ দিন | দোলযাত্রা— | ১ দিন |
| মহালয়া— | ১ দিন | শিবরাত্রি— | ১ দিন |
| দুর্গাপূজা— | ১৫ দিন | চৈত্রসংক্রান্তি— | ১ দিন |
| শ্যামাপূজা— | ২ দিন | স্বাধীনতা দিবস— | ১ দিন |
| বড়দিন— | ১ দিন | নেতাজী জন্মদিন— | ১ দিন |
| সরস্বতীপূজা— | ২ দিন | গান্ধীজন্মদিন— | ১ দিন |

জন্মাষ্টমী—১ দিন।

৮। পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালীদের মধ্যে বিদ্যালয়সমূহে বাংলা পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করিবার জন্য পরিষৎ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

**সংবর্দ্ধনা:** (ক) পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী ও আজীবন সেবক শ্রীরামকমল সিংহ গত ১৬ই পৌষ ১৩৫৬ তাঁহার সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর কালের কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের পরে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক প্রীতি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ২৫০৲ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে শ্রীযুক্ত সিংহের কার্য্যের উল্লেখ করেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত এবং সুযোগ্য কর্ম্মীর সেবার দ্বারা পরিষদের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে মাসিক ৩৫৲ টাকার পেন্‌সন দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(খ) গত ৭ই মাঘ ১৩৫৬, কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য একটি প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন হয়। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়-প্রেরিত বাণী, সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানপত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের বক্তৃতায় এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

**সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা** : আলোচ্য বর্ষেও ষট্পঞ্চাশত্তম ভাগ পত্রিকা দুইটি যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

**পুথিশালা** : আলোচ্য বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৫৯০৫ খানি। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা—৩১৭৬, সংস্কৃত—২৩৯৪, তিব্বতী—২৪৪, অসমীয়া—৩, উড়িয়া—৪, হিন্দী—১, ও ফার্সী—১৩।

এতদ্ব্যতীত ডঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু পরিষদের পুথিশালায় ১৫ খানি পুথি এবং অতিরিক্ত কয়েক জোড়া পুথির পাটা দান করিয়াছেন। বহু অনুসন্ধিৎসু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

**রমেশ-ভবন** : ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং অফিসরূপে এবং নিম্ন তলের দক্ষিণ দিকস্থ বারাণ্ডা সাহিত্য-পরিষৎ-পোষ্ট অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্ন তলের হল-ঘরটি যথাসম্ভব গুছাইয়া রাখা হইয়াছে।

**পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বদান্যতা** : পরিষদের "Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকার বার্ষিক সাহায্যও পাওয়া গিয়াছে।

**গ্রন্থ-প্রকাশ** : সাধারণ তহবিলের অর্থে (ক) রামেন্দ্র-রচনাবলীর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ও ৫ম খণ্ডের মুদ্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে। (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'পরিষৎ-পরিচয়' এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত ৭৬-৮২ সংখ্যক পুস্তক (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু; নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন; রজনীকান্ত সেন; দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়; চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়), (গ) ২য় খণ্ড 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এবং (ঘ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র একটি অভিনব সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর 'সারদামঙ্গল'; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' এবং 'শুভ বিবাহ'-রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ,' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'; দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ও 'বিয়েপাগলা বুড়ো,' মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' এবং ভারতচন্দ্র রায়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান'এর মুদ্রণ চলিতেছে। ইহার অনুবাদক শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

**গ্রন্থাগার** : আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩০০ খানি পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা (ক্রীত—১৩৩, উপহারপ্রাপ্ত—২৭৮) সংযোজিত হইয়াছে। সংগৃহীত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। কৃষ্ণকান্তের উইল (১ম সং ১৮৭৮), ভারত মহিলা (১ম সং), ভারত হিন্দু সভার

সভাপতির অভিভাষণ ( হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ) উল্লেখযোগ্য। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও পত্রিকার বিনিময়েও উপহারস্বরূপ বহু পুস্তক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বদান্যতায় এই কার্য্য শীঘ্রই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

আলোচ্য বর্ষেও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

**কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান:** পূর্ব্ববৎ এবারও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন; পরিষৎ এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। সুখের বিষয়, এই বৎসর তাঁহারা ( পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ ) যে দুই বাবের ( ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ ) সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ১৯৪৬-৪৭ বাবদ মাত্র ৫০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়াছেন যে, বাকী টাকা তাঁহারা শীঘ্রই মিটাইয়া দিবেন।

**দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার:** আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার হইতে কবি করুণানিধানকে প্রদত্ত টাকার তোড়ার জন্য ২৫০৲ টাকা এবং কবি শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য সাহায্য বাবদ ১৫০৲ দেওয়া হইয়াছে। ময়মনসিংহের সাহিত্যিক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এককালীন ২৫৲ সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

**বঙ্কিম-ভবন:** পরিষদের নৈহাটি শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে। এই স্থানে বঙ্কিমের জন্মশতবার্ষিক উৎসব প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

**শাখা-পরিষৎ:** আলোচ্য বর্ষে পুনা ( বোম্বাই ) ও কাটিহার ( বিহার ) হইতে শাখা-পরিষদ্ স্থাপন করিবার জন্য আবেদন আসিয়াছিল। উভয় প্রতিষ্ঠানকে শাখা-পরিষৎ স্থাপন করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে কেবল মাত্র কাটিহারে শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে—এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কাটিহারে সম্পাদক-পদে শ্রীসুধীন দাসগুপ্ত অধিষ্ঠিত আছেন।

**নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন:** কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মূল নিয়মাবলীর ১৪ ধারার প্রথমাংশ ও ৭৩ ধারা এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন:—

"১৪। যে-কোন বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ( একজন প্রতিনিধি মারফৎ ) পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

৭৩। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে কোষাধ্যক্ষ সম্পাদকের সহিত, অথবা প্রয়োজন ঘটিলে কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও অপর একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ, এই তিন জনের যে-কোন দুই জন—সকল তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিতে পারিবেন।"

এই পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী যথারীতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত হইয়াছে।

**রামপ্রাণ গুপ্ত-পুরস্কার**ঃ ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় গত ১৬ই পৌষ ১৩৫৬ তারিখে "প্রাচীন বাঙ্গালীর ইতিহাসের ইঙ্গিত" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তা পুরস্কারের অর্থ নিজে গ্রহণ না করিয়া পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

কলিকাতার মেসার্স বি. এন. মুখার্জি এণ্ড কোং ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু (চার্টার্ড একাউন্টান্টস্) পরিষদের সমুদয় হিসাব-পত্র যথারীতি পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

**উপসংহার**ঃ পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমরা নানা ভাবে কর্ম্মী ও সদস্যদের সহায়তায় পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে পারিলেও অর্থাভাবে সকলের সকল অসুবিধা দূর করিতে পারি নাই। পরিষৎ-মন্দিরের সংস্কার ব্যাপারে যে আর্থিক ব্যয়ের আমরা সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অথবা পূর্ব্বকালের মত কোন বদান্য ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া আমরা মিটাইতে পারিব না। মন্দির-সংস্কার এবং বৈদ্যুতিক তার আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে গবেষণাপ্রয়াসী সদস্যদের যথোপযুক্ত সুবিধা দিতেও আমরা পারিতেছি না—অনেকে অনেক অসুবিধার মধ্যে তথাপি কাজ চালাইয়া যাইতেছেন, পরিষদের এই লজ্জা অচিরাৎ দূর করা আবশ্যক। কলিকাতা পৌর-সভা বার্ষিক নিয়মিত সাহায্য রহিত করিয়া নূতন নূতন পুস্তক-সংগ্রহের সুযোগ হইতে পরিষৎকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যদি এককালীন সাহায্য আমরা সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যকে তৎপর হইয়া নূতন সদস্যবৃদ্ধি দ্বারা অর্থাগমের পথ সুগম করিতে হইবে। তাঁহাদের সাহায্য পাইলে আমরা বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকেও আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারিব, এবং নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা ও আলোচনা-সভা আহ্বান করিয়া সকলের সহিত যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করিতে পারিব। ফলে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রও বিস্তৃততর হইবে। আমার নিবেদন তাই আজ প্রধানতঃ সদস্যদের নিকট। সকলের সক্রিয় সাহায্যই আমাদের প্রার্থনীয়। দূরে থাকিয়া শুধু বার্ষিক চাঁদা দিয়াই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, পরিষৎ-মন্দিরে নিয়মিত হাজিরা দিয়া ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে এই পরিষৎই আবার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মাধ্যমে সকল বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র হইবে—সাহিত্য-পরিষৎ যথার্থ সার্থকতা লাভ করিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।